গ্লোবাল ডায়ালগ

১৫.২

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান

রাজেশ মিশ্র
মৈত্রেয়ী চৌধুরী
ইন্দিরা রামারাও
অরবিন্দর আনসারি
শ্রুতি তাম্বে

চরমপন্থি মূলধারা

সাব্রিনা জাজাক
ইমানুয়েলে তস্কানো
আনড়বা-মারিয়া মইথ
টেরি গিভেন্স
দামলা কেস্কেকেচি
পাশা দাশতগাড
আন্দ্রিয়া গ্রিপ্পো
সুমরিন কালিয়া
রোবের্তো স্কারামুজ্জিনো
সেসিলিয়া সান্তিল্লি

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আনাহিদ আল-হারদান
জুলিয়ান গো

উন্মুক্ত বিভাগ

- > ডার্সি রিবেইরো এবং দক্ষিন থেকে একটি বৈশ্বিক তত্ত্ব
- > জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের অপব্যবহার ও ফিলিস্তিন সংহতির বহুমাত্রিক দমন
- > বিভক্ত নগর ঃ ইরানে নারীবিদ্বেষী নগরায়নের সমালোচনা

খন্ড ১৫ সংখ্যা ২/আগস্ট ২০২৫
https://globaldialogue.isa-sociology.org/
জিডি

> সম্পাদকীয়

এই বছরের দ্বিতীয় সংখ্যাটি শুরু হয়েছে ভারতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, যেটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণবন্ত সমাজতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। ভারতীয় সমাজতত্ত্ব নিবেদিত এই অংশে দেশের পাঁচজন প্রধান বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন আদিবাসী ও পশ্চিমা সমাজতত্ত্বের মধ্যে টানাপোড়েন, চিন্তাধারার উপনিবেশবাদ বিমোচনের চলমান প্রচেষ্টা, ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ঐতিহাসিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, এবং নারীবাদ ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব। ভারতীয় বিতর্কের এই কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সংস্থাকে শ্রদ্ধা জানাই, যা ডিসেম্বর ২০২৫-এ তার ৫০তম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করবে।

এই সংখ্যার প্রধান বিষয়বস্তু হলো পক্ষপাতদুষ্ট রক্ষণশীলতাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা। সাবরিনা জাজাক, ইমানুয়েলে টোস্কানো এবং আন্না-মারিয়া মেউথ কর্তৃক নির্বাচিত সাতটি প্রবন্ধ যুক্তি উপস্থাপন করে যে, দারুণ অধিকার ইতিমধ্যেই "নতুন স্বাভাবিক" হয়ে উঠেছে। তারা এই প্রবণতাকে "র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম" হিসেবে উগ্রভাবে বর্ণনা করেছেন, যা কর্তৃত্ববাদী, লিঙ্গবৈষম্যপূর্ণ, জাতিগত-জাতীয়তাবাদী, অভিবাসনবিরোধী, অধিকারের বিরোধী, এবং বহুত্ববাদ বিরোধী মতাদর্শের ব্যাপক স্বাভাবিকীকরণকে নির্দেশ করে। লেখকরা বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল কৌশল যেগুলো দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট রক্ষণশীলতা স্বীকৃতি পায় এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতগুলো পুনর্গঠন করে। তারা ইউরোপীয় দলের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চরমপন্থী বিষয়বস্তুকে মেইনস্ট্রিমে পরিণত করার ভূমিকা, এবং ম্যানোস্ফিয়ারের পুরুষ আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রের র‍্যাডিকালাইজেশনসহ বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। পক্ষপাতদুষ্ট রক্ষণশীলদের ফ্যাশনের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে পরিচিতি গঠন এবং মতাদর্শের বিস্তারের সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রবন্ধগুলো তুলে ধরে কিভাবে পক্ষপাতদুষ্ট রক্ষণশীলরা বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় সমাজে অনুপ্রবেশ করে, এবং কিভাবে পপুলিস্ট শাসনব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী ও বর্জনমূলক এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক স্থান পুনর্গঠন করে।

আমাদের "তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি" অংশে, প্যালেস্টাইনীয় সমাজতত্ত্ববিদ আনাহীদ আল-হারদান এবং আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ জুলিয়ান গো উপনিবেশবাদ বিমোচন চিন্তাধারাকে সমালোচনামূলক সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে পুনরুদ্ধার করেছেন। তারা যুক্তি দেন যে, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামগুলি মৌলিক ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি উত্পন্ন করেছে যা সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। ভৌগলিক পরিচয়ে সমালোচনা স্থাপন করার পরিবর্তে, তারা বিদ্রোহী তত্ত্বের জন্য উপনিবেশবিমোচন অবস্থানকে উৎপাদনশীল ভিত্তি হিসেবে প্রস্তাব করেন।

আমরা এই সংখ্যা শেষ পর্বে আমাদের উন্মুক্ত বিভাগে ("ওপেন সেকশন" এর) তিনটি বৈচিত্র্যময় অবদান রাখা হয়েছে । প্রথমটি ব্রাজিলীয় চিন্তাবিদ ডার্সি রিবেইরোর ঐতিহ্য এবং বিশ্ব সমাজতত্ত্বে তার অবদান পুনর্বিবেচনা করে। দ্বিতীয়টি জার্মান প্রেক্ষাপটে গাজা যুদ্ধে বিশ্লেষণ করে, যেটিতে অ্যান্টি-সেমিটিজমের অস্ত্রায়ন, মতবিরোধের নীরবতা, এবং একাডেমিক ও জনসাধারণের মধ্যে প্যালেস্টাইনিয়ান ঐক্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দমনমূলক কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। শেষ প্রবন্ধটি ইরানে নগর জীবন নির্মাণে নারীদের নীরবতাকে সমালোচনা করে।

আমাদের পরবর্তী সংখ্যা পুরোপুরিভাবে বিশ্বসংলাপের গ্লোবাল ডায়ালগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাইকেল বুরাওয়ের স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হবে, যিনি সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আপনি যদি এ বিষয়ে অবদান রাখতে চান বা কোনো পরামর্শ শেয়ার করতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ■

ব্রেনো ব্রিনিউ, গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue@isa-sociology.org

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel.

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:

আরব বিশ্ব: (লেবানন) Sari Hanafi, (তিউনেশিয়া) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, ড. বিজয় কৃষ্ণ বনিক, শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মোঃ আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, ড. তোহিদ খান, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ড. রাসেল হোসাইন, রুমা পারভীন, ইয়াসমিন সুলতানা, সাদিয়া বিনতে জামান, মোঃ নাসিম উদ্দীন, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, আরিফুর রহমান, একরামুল কবির রানা, আলমগীর কবির, সুরাইয়া আক্তার, তাসলিমা নাসরিন, মো. শাহীন আক্তার

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Carine Passos.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav.

ইন্দোনেশিয়া: Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Ario Seto, Nurul Aini, Aditya Pradana Setiadi, Rusfadia Saktiyanti Jahja, Harmantyo Pradigto Utomo, Gregorius Ragil Wibawanto.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade, Ali Ragheb.

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Anna Turner, Joanna Bednarek, Sebastian Sosnowski.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca-Elena Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: WanJu Lee, Zhi Hao Kerk, Yi-Shuo Huang, Mark Yi-Wei Lai, Yun-Jou Lin, Tao-Yung Lu, Ni Lee.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu.

__ভারতীয় সমাজতত্ত্ব__ নিয়ে থিম্যাটিক অংশে আলোচিত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম প্রাণবন্ত সমাজতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিতর্ক।

চরম ডানপন্থার স্বাভাবিকীকরণ ও র‍্যাডিকালাইজড মূলধারার থিম্যাটিক অংশে আলোচনার বিষয় ছিল–যা এত দিন 'চরম ডানপন্থা' নামে পরিচিত ছিল, সেটাই কেমন করে হয়ে উঠছে নতুন স্বাভাবিক।

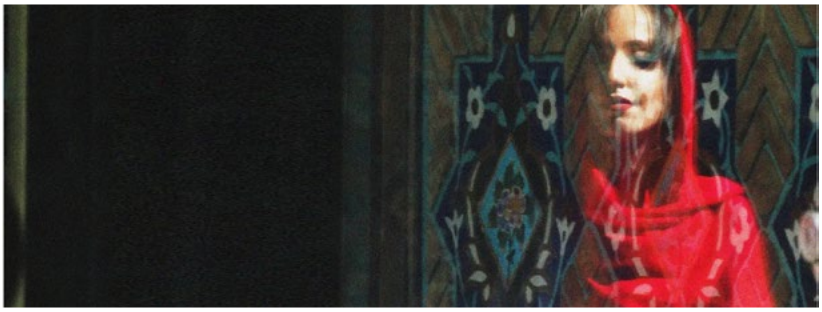

উন্মুক্ত বিভাগে রয়েছে নানা অবদান–ব্রাজিলিয়ান চিন্তক দারসি রিবেইরোর উত্তরাধিকার, জার্মান প্রেক্ষাপটে গাজার যুদ্ধ, আর ইরানের নগর জীবনে নারীদের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

কভার পেজের ক্রেডিট: টাওরিনো, মাছধরা জেলে, মারাজো (পারা, ব্রাজিল)। ছবি: লারা সার্তোরিও গনসালভেস, ২০২৫।

জিডি

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই সংখ্যার বিষয়সূচী

সম্পাদকীয় ২

> ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান

পার্থক্যের সংলাপ: দেশীয় ধারণা ও পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব
রাজেশ মিশ্র, ভারত ৫

ভারতে সমাজবিজ্ঞানের দৈনন্দিন চর্চা:
বিউপনিবেশিক চিন্তার অতীত অনুধ্যান
মৈত্রেয়ী চৌধুরী, ভারত। ৮

দক্ষিণ ভারতে সমাজবিজ্ঞান
ইন্দিরা রামারাও, ভারত ১০

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে নারী :
নারীবাদী অবদান, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রচলিত প্রথা
আরভিন্দার আনসারি, ভারত ১২

ভারতের প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন অধ্যয়নের নতুন ভাবনা
শ্রুতি তাম্বে, ভারত ১৫

> চরমপন্থি মূলধারা

ফার-রাইট স্বাভাবিকীকরণ এবং র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম
সাব্রিনা জাজাক, জার্মানি; **ইমানুয়েলে তস্কানো,** ইতালি;
এবং **আন্না-মারিয়া মইথ,** জার্মানি ১৮

"চরম" ডানপন্থা থেকে মূলধারার ডানপন্থায়:
ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর
টেরি গিভেন্স, কানাডা ২১

প্রান্তিকতা থেকে প্রচারে:
চরম ডানপন্থীদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির প্লাটফর্ম
দামলা কেসকেকচি, ইতালি ২৩

পুরুষত্বের উন্নয়ন: পুরুষদের আত্মউন্নয়ন নেটওয়ার্ক
এবং আদর্শগত সংঘর্ষের ক্ষেত্র
পাশা দাশতগার্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬

উগ্র ডানপন্থীদের দ্বারা ফ্যাশনের অস্ত্রীকরণ
আন্দ্রিয়া গ্রিপ্লো, অস্ট্রিয়া ২৯

উগ্র ডানপন্থা কিভাবে নাগরিক সমাজের উপর চেপে বসছে
সুমরিন কালিয়া, জার্মানি ৩১

নাগরিক সমাজের প্রচারণার উপর জনতাবাদী শাসনব্যবস্থার প্রভাব
রোবের্তো স্কারামুজ্জিনো এবং **সেসিলিয়া সান্তিল্লি,** সুইডেন ৩৪

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাস ও সামাজিক তত্ত্বে ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা
আনাহিদ আল-হারদান, যুক্তরাষ্ট্র, এবং **জুলিয়ান গো,** যুক্তরাষ্ট্র ৩৭

> উন্মুক্ত বিভাগ

ডার্সি রিবেইরো এবং দক্ষিন থেকে একটি বৈশ্বিক তত্ত্ব
অ্যাডেলিয়া মিগলিভিচ-রিবেইরো, ব্রাজিল ৪০

জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের অপব্যবহার
ও ফিলিস্তিন সংহতির বহুমাত্রিক দমন
বেনামী লেখকবৃন্দ, জার্মানি ৪৩

বিভক্ত নগর ঃ ইরানে নারীবিদ্বেষী নগরায়নের সমালোচনা
আর্মিতা খালাতবারী লিমাকি, ইরান ৪৭

> "ডানপন্থী উগ্রতার স্বাভাবিকীকরণের এই দ্বৈত প্রবাহ মূলধারাকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা একটি বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক প্রবণতার ইঙ্গিত; যেখানে প্রান্তিক ও মূলধারা, চরম ও মধ্যপন্থার সীমারেখা ধূসর হয়ে যায়।"

দামলা কেসকেকচি

> পার্থক্যের সংলাপ:

দেশীয় ধারণা ও পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব

রাজেশ মিশ্র, লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

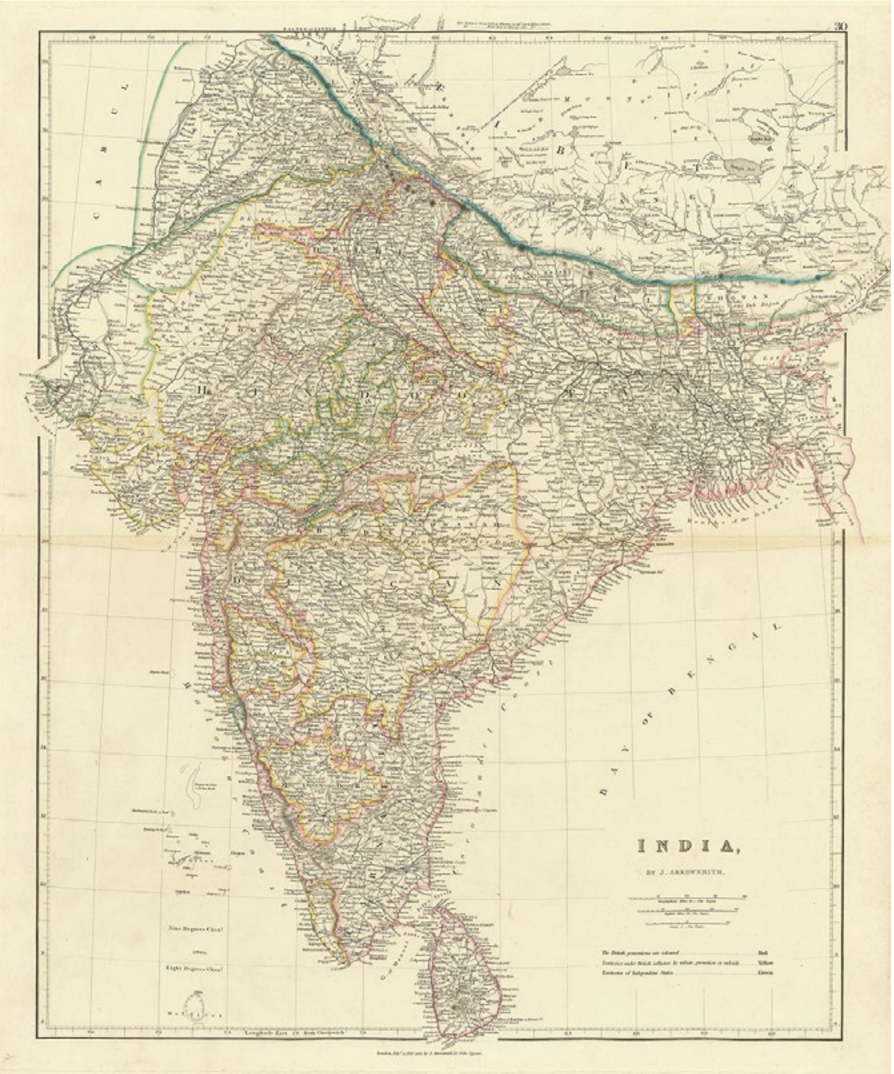

ক্রেডিট: জন অ্যারোসমিথ, পাবলিক ডোমেইন, উইকিমিডিয়া কমন্সের মাধ্যমে।

বি-উপনিবেশায়ন এবং আদিবাসী সমাজবিজ্ঞানকে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনা ১৯৯০-এর দশকে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, ভারতের সমাজবিজ্ঞান শুরু থেকেই দেশীয় ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে এসেছে। এই গুরুত্ব দুটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে এসেছে: প্রথমত, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে এবং দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক প্রেক্ষাপট থেকে।

> স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাশ্চাত্য বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা সমাজতত্ত্ব

একাডেমিক শাস্ত্র হিসেবে ভারতে সমাজবিজ্ঞান একটি বিকাশ বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, সমকালীন ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানিতে সমাজবিজ্ঞান বিকাশের অভিজ্ঞতার সমসাময়িক। ভারতে প্রথম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে, একই বছর ম্যাক্স ভেবার মিউনিখের লুডভিগ ম্যাক্সিমিলিয়ান

>>

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তারও আগে, ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই। ভারতের প্রথম সমাজতাত্ত্বিক সাময়িকী The Indian Sociologist প্রকাশিত হয় লন্ডনে ১৯০৫ সালে, যা শুরু করেছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা। ওই একই বছরে ব্রিটেনে প্রকাশিত হয় Sociological Papers, যা পরে ধ্রুব Sociological Review (১৯০৭)-এর সূচনা করে, যা ছিল ব্রিটেনের প্রথম সমাজতাত্ত্বিক সাময়িকী। ভারতে আরও একটি সাময়িকী The Indian Sociological Review ১৯২০-এর দশকে বরোদার একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন দার্শনিক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পাদকদের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি উল্লেখযোগ্য। অন্যকথায়, ভারতের সমাজতত্ত্বের ভিত্তি গড়ে ওঠেছিলো স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত মতাদর্শিক প্রবণতা ও পাশ্চাত্য বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ক্রমবিস্তারের গতিশীল মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে।

যদিও ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল এবং বিদেশি বিশ্বাস, জ্ঞানচর্চার কর্মসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তবুও ১৯২০-এর দশক ছিল ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এই দশকে ব্রিটিশবিরোধী ঐক্যের রাজনৈতিক চেতনা, উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ এবং শ্রমিক ধর্মঘট একত্রে জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময়েই প্রণয়ন করা হয় দমনমূলক রাউলাট আইন, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন, যার মধ্যে দিয়ে আত্মশাসনের সম্ভাবনা প্রথমবারের মতো উত্থাপিত হয়। একই সময়ে খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ ঘটে। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৫ সালে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২০-এর দশকের শেষভাগে স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন গতি পায় এবং ব্যাপক গণ-সংগঠনের মাধ্যমে বিক্ষোভে রূপ নেয়। পাশাপাশি, তথাকথিত "নিম্নবর্গের" প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহ রাজনৈতিক পরিসরে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিতে শুরু করে। তারা 'উচ্চ জাতি'র আধিপত্যের সমালোচনা করে এবং মাদ্রাজ আইনসভায় কয়েকটি সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

এই সব আন্দোলন, সংগঠন ও উদ্যোগগুলোর নেতৃত্বে ছিল একটি নবউদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা ইউরোপীয় চিন্তা-ধারায় শিক্ষিত হলেও প্রতিরোধের শক্তি আহরণ করছিল নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্য থেকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আরেকটি অংশ নিয়োজিত ছিল একাডেমিক ও বৌদ্ধিক পেশায়। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক চিন্তায় দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

> বহুমাত্রিক দার্শনিক ঐতিহ্যের দীর্ঘ ইতিহাস

সমাজবিজ্ঞানের দেশীয়করণকে একটি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটেও ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতের দার্শনিক ও চিন্তাশীল ঐতিহ্য পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় উত্তরাধিকারগুলোর একটি, যেখানে রয়েছে নানা দর্শনীয় মতবাদ এবং বিস্তৃত চিন্তার ক্ষেত্র। ঐতিহাসিকভাবে, ভারতীয় দর্শনচিন্তা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিতই হয়নি, বরং এসবকে প্রভাবিতও করেছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা অস্তিত্বতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে; যা সমাজজীবন, রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে গঠনের পথনির্দেশ দিয়েছে।

মধ্যযুগ জুড়ে ভারতীয় দর্শন উল্লেখযোগ্য বিকাশের মধ্য দিয়ে যায়। হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারার সৃজনশীল মেলবন্ধন ঘটে, পাশাপাশি ভক্তি ও সুফি আন্দোলনের উত্থান ঘটে, যা সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সাম্প্রতিক সময়ে জনবুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা প্রাচীন অন্তর্দৃষ্টি বর্তমান সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, উপস্থাপন করেছেন সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও অহিংস প্রতিরোধের মতো ধারণা। ভারতীয় দর্শনের এই বহুমাত্রিক চরিত্র এক সমৃদ্ধ বুননের প্রতীক, যেখানে বিভিন্ন উপাদান অস্তিত্ব, সমাজ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতর বোঝাপড়ায় অবদান রাখে। এই উত্তরাধিকার শুধু অতীতকে প্রতিফলিত করে না, বরং বর্তমানকে বোঝারও চেষ্টা করে। এটি ভারতে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে এবং সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চিন্তাধারাকেও গঠন করেছে।

> ভারতের জন্য সমাজবিজ্ঞান না ভারতের সমাজবিজ্ঞান?

উল্লেখিত এই দুই প্রেক্ষাপটে, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান ধারাবাহিকভাবে দেশীয়করণ, প্রেক্ষাপটনির্ভরতা ও ইউরোপীয়করণ নিয়ে আলোচনায় যুক্ত থেকেছে, যার কেন্দ্র ছিল তৎকালীন একাডেমিক শহর বোম্বাই (মুম্বাই), কলকাতা ও লখনউ। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানিক বিকাশে এক প্রকার অধস্তন অবস্থান দখল করেছিল; নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, দর্শন ও পৌরনীতি তুলনায় এটি প্রায়শই 'অতিরিক্ত' একটি শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে বোম্বাই (মুম্বাই), লখনউ ও কলকাতার সমাজতাত্ত্বিক চর্চা ভারতীয় বাস্তবতায় ভিত্তিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে স্বাধীন গতিপথ তৈরি করতে চেষ্টা করেছিল, এবং নিজেদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখেছিল।

এই প্রেক্ষিতে, সমাজবিজ্ঞানে দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত করার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়: প্রথমটি হল ঐতিহ্যবাদী, যা পুরোপুরি পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের ধারা প্রত্যাখ্যান করে এবং যুক্তি দেয় যে ভারতীয় সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য কেবলমাত্র দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা ক্লাসিকাল দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত এবং দেশীয় ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা বর্তমানে ভারতীয় (হিন্দু) জ্ঞানতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় প্রবণতাটি হলো কঠোর সমাজতাত্ত্বিক, যা পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহকে একদিকে সাধারণীকরণ ও অন্যদিকে নির্দিষ্টীকরণে মনোনিবেশ করে। তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের গতিশীল বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে, যেখানে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও দার্শনিক অনুশীলনের প্রভাবকে স্বীকার করার পাশাপাশি ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেও যুক্ত করা হয়। এই প্রচেষ্টাকে দেখা যায় বেদান্তিক দর্শন, ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি ও মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ত্রিভুজীকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিকীকরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে।

যেখানে প্রথম প্রবণতাটি একটি একমুখী স্বগত সংলাপকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেখানে তৃতীয়টি দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বিমুখী সংলাপ প্রতিষ্ঠা করে, যা একটি বৈশ্বিক আলাপের সূচনা করে। এই প্রেক্ষিতে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক গড়ে ওঠে, যারা দুই বিপরীত ধারণা উপস্থাপন করেন: "ভারতের জন্য সমাজবিজ্ঞান " এবং "ভারতের সমাজবিজ্ঞান।" এই সংলাপের কেন্দ্রে ছিল সমাজবিজ্ঞান কি কেবল ভারতীয় সমাজের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যায় নিবদ্ধ থাকবে, নাকি এটি সমস্ত সমাজ নিয়ে বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করবে, যেখানে ভারত একটি ক্ষেত্রমাত্র? সাম্প্রতিক সময়ে উপনিবেশে-উত্তর নিয়ে একটি নতুন আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে, যদিও এটি এখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি।

> দেশীয় ও পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের মধ্যে চলমান ও বিকাশমান সংলাপ

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারতের সামাজিক বিজ্ঞান চর্চায় দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ইউরোপীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই প্রবণতা

>>

একদিকে প্রচলিত জ্ঞানতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে স্বীকৃতি দেয়, অন্যদিকে আধুনিক অর্থনৈতিক রূপান্তর, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির কার্যকারিতা মেনে নেয়। তবে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো প্রায়ই ভারতের অনন্য সামাজিক প্রথা ও গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে, যার ফলে উপনিবেশ-পরবর্তী ভারতে একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শাস্ত্রসমূহের উপনিবেশমুক্তকরণ এবং বৌদ্ধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তা-উপস্থাপনায় উঠে আসে সাংস্কৃতিক চর্চা, বৈচিত্র্য, গ্রামীণ সমাজ, জাতপাতের গঠন, আত্মীয়তার বন্ধন, জাতিগত পরিচয়, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য, কৃষি আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মতো বিষয়গুলোর গুরুত্ব। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর এইসব বিষয় নিয়ে নতুন ধারণা ও মডেল প্রস্তাব করা হয়, যাতে ভারতের সমাজকে তার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বোঝা যায়।

যদিও হিন্দু জ্ঞানতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র এবং সৃজনশীলভাবে বিভিন্ন প্রাচ্য চিন্তাধারার সঙ্গে সমন্বিত, তবুও পাশ্চাত্য জ্ঞানতন্ত্র ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি অস্বীকারযোগ্য আকর্ষণ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, প্রত্যয়, পদ্ধতি এবং তত্ত্ব এখনো ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য, যদিও দেশীয়করণ ও প্রেক্ষিতায়নের একটি দৃঢ় ঐতিহ্য বিদ্যমান। বলা যেতে পারে, দেশীয় সমাজবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে চলমান সংলাপ এই শাস্ত্রের বিকাশের পথকে প্রতিফলিত করে।

তদুপরি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দেশীয়করণের প্রক্রিয়াও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। এ সময়ে দলিত অধ্যয়ন, আদিবাসী অধ্যয়ন ও জেন্ডার স্টাডিজের মতো নতুন গবেষণা ক্ষেত্র উঠে এসেছে, যা মূলত সাবঅল্টার্ন ও সমালোচনামূলক তত্ত্ব সমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগত সমাজ থেকে আধুনিকতার দিকে অগ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক সমাজতত্ত্বে দেশীয় অন্তর্দৃষ্টি যোগ করছেন। যদিও সমাজবিজ্ঞান মূলত পশ্চিমে বিকশিত একটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং এখনও পশ্চিমা ধারার প্রবলভাবে প্রভাতিব, তবে একথা বলা যাবে না যে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব তার ইতিহাস জুড়ে সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা কাঠামোর আধিপত্যে ছিল, সেটা উপনিবেশিক সময়ে হোক কিংবা স্বাধীনতার পর।

শুরু থেকেই দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার গুরুত্ব স্বীকার করার নানা উদ্যোগ হয়েছে, যেখানে একদল দৃঢ়ভাবে ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যে ভিত্তি করেছেন, আবার অন্যরা পশ্চিমা সমাজতাত্ত্বিক ধারণা গ্রহণ করেও ভারতীয় প্রেক্ষাপটকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক প্রয়োগ, কিংবা দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বৈশ্বিক প্রভাবের মেলবন্ধন এখনো কঠিন চ্যালেঞ্জ হলেও, দেশীয় সমাজবিজ্ঞানকে শক্তিশালী করা এবং দেশীয় অন্তর্দৃষ্টি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে যুক্ত করার জন্য অবিচল প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

সরাসরি যোগাযোগঃ রাজেশ মিশ্র <rajeshsocio@gmail.com>

অনুবাদঃ
ড. খায়রুল চৌধুরী, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> ভারতে সমাজবিজ্ঞানের দৈনন্দিন চর্চা:

বিউপনিবেশিক চিন্তার অতীত অনুধ্যান

মৈত্রেয়ী চৌধুরী, সভাপতি, ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি ও অধ্যাপক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, ভারত

ভারতে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান–এই দুটি ঘনিষ্ঠ কিন্তু বিতর্কিত সম্পর্কযুক্ত শাস্ত্র–শুরু হয় উপনিবেশিক শাসনামলে। ফলে উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং জটিল। সাম্প্রতিক দশকে শাস্ত্রীয় ইতিহাস এবং উপনিবেশবিরোধী চিন্তার সঙ্গে সামাজিক তত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে একগুচ্ছ গবেষণার আবির্ভাব ঘটেছে।

তবে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের অভ্যন্তরে বহুকাল ধরে একটি বিতর্ক চলেছে: বিদেশি ধারণার সীমাবদ্ধতা এবং নিজস্বতার অনুসন্ধান। Sociological Bulletin, Contributions to Indian Sociology এবং Seminar-এর আলোচনায় এর স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়।

বিশ্বজুড়ে এখন 'বিউপনিবেশায়ন' নিয়ে উৎসাহ থাকলেও, এটি ভারতে একধরনের 'আমদানিকৃত' ধারণা, যা নিজেই একসময় উপনিবেশ ছিল। প্রশ্ন জাগে: এই পটভূমিতে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে কি আমরা আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিবেশমুক্ত চর্চা হিসেবে পড়তে পারি? এবং যদি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান বরাবরই পাশ্চাত্য শ্রেণিকরণের সমালোচনায় ব্রতী থেকেছে, তবে তারা কি আদৌ একমত হয়েছিল এই একাডেমিক উপনিবেশবাদের সমালোচনার প্রকৃতি নিয়ে?

পরের প্রশ্নটির উত্তর সম্ভবত পুরোপুরি 'না'। ভারতের প্রথমদিকে সমাজবিজ্ঞানীরা জাতি নির্মাণ, সামাজিক সংস্কার এবং বিজ্ঞানের মূল্যবোধ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। তবে আরেকটি ধারা, যেটি তুলনামূলকভাবে নীরব ছিল, তা হলো ভারতের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব বিশ্লেষণী ক্যাটাগরি নির্মাণের আহ্বান। যদিও এর মধ্যেও নানা মতভেদ ছিল। তবে হিন্দুত্ববাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান কাঠামো (আইকেএস) এর আধিপত্য বিস্তারে এই দাবি নতুন বৈধতা পায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এর সাথে উপনিবেশবাদমুক্তির ধারণার একটি প্রয়োগ ঘটেছে, যা এই প্রশ্নটি জাগিয়ে তুলেছে: উপনিবেশবাদ মুক্তিকে আমরা কীভাবে দেখব?

> উপনিবেশমুক্তি: একটি 'কর্ম'

'উপনিবেশমুক্তি' বিষয়ে লেখা পড়লে বোঝা যায়, এটি একক কিছু নয়–বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি একটি ক্রিয়াপদ হিসেবে বোঝা ভাল, মানে এটা করার বিষয়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাস ও পাঠদান প্রক্রিয়াকে উপনিবেশমুক্ত করার প্রয়াস আমাকে আমার নিজের শিক্ষকতাকে পুনর্বিবেচনার দিকে ঠেলে দেয়। আমি ভাবলাম–এই শব্দটি আমি কি অতীত অনুধ্যান থেকে প্রয়োগ করতে পারি? আমি আমার দুটি অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি–ভারতে নারীবাদ নিয়ে লেখা এবং কোর্স পড়ানো এবং সমাজ পরিবর্তনের ধারণা নিয়ে পাঠদান। এই বিষয়টির প্রেক্ষাপট আরো উপলব্ধি করতে, আমি ১৯৭০-এর শেষভাগে ছাত্রজীবনে প্রবেশ করেছিলাম এবং ১৯৮০-এর শেষভাগে শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম।

> "বিউপবেশীকরণ আমাদের কথা বলার একটি ভাষা দেয়"

> লিঙ্গ পাঠদান ও নারীবাদের স্বীকৃতি

পশ্চিম আমাদের দৈনন্দিন একাডেমিয়ায় খুবই বিকৃতভাবে উপস্থিত ছিলো। আমাদের পাঠ্যক্রমে এর উপস্থিতি ছিল প্রাণবন্ত। এটি এতটাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে, ১৯৯০-এর দশকে 'নারী ও সমাজ' নিয়ে পাঠদান শুরু করার সময় আমি একধরনের অস্বস্তি অনুভব করতাম কারণ এখানে পাশ্চাত্যের উদার, সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক নারীবাদী তত্ত্ব দিয়ে শুরু করাটাই ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমার কাছে ইতিহাস দিয়েই শুরু করাটা বেশি অর্থবহ মনে হয়েছিল। পরে বুঝলাম, ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া জরুরি ছিল, কারণ তৎকালীন তাত্ত্বিক কাঠামোতে আমাদের আলাদা ইতিহাসের জায়গা ছিল না। তখনো 'বহুমাত্রিক আধুনিকতা' বা 'ইউরোপকে প্রাদেশিকীকরণ' ভারতের তীরে পৌঁছায়নি। 'তৃতীয় বিশ্ব নারীবাদ'ও তখনো গ্লোবাল নর্থের পাঠক্রমে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। আমরা তখনো ভাষার অভাবে বলতে পারছিলাম না যে, আমাদেও কালে বিশ্ব ইতিহাস ভিন্ন। আমাদের কাছে আধুনিকতার ইতিহাস আলাদা, যেমন আমাদের নারীবাদী ইতিহাসও তাই ছিলো।

ভারতে নারীবাদের ধারণাগত বিবরণ লেখার জন্য যখন আমি সংগ্রাম করছিলাম, তখন আমি প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জগুলি থেকে শেখার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমটি ছিল এই বিশ্বাস যে, ভারতে নারীবাদ নিয়ে বিতর্ক হয় নি। অতীতের দিকে তাকালে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এর অর্থ হল আমাদের কাছে মার্কসবাদ এবং নারীবাদের অসুখী বিবাহের মতো কোনও বিতর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, স্পষ্ট কিন্তু প্রায়শই উপেক্ষিত সত্যটি হল যে, পশ্চিমা নারীবাদীদের জন্য অ-পশ্চিমা

>>

নারীবাদের সাথে জড়িত হওয়া বা না থাকা একটি বিকল্প যা তারা বেছে নিতে পারেন, অ-পশ্চিমা নারীবাদী বা নারীবিরোধীদের কাছে এমন কোনও স্পষ্ট পছন্দ নেই। আমাদের জন্য, আধুনিকতায় আমাদের প্রবেশ উপনিবেশবাদের মধ্যস্থতা করেছে, যেমন জাতীয়তাবাদ বা গণতন্ত্র, মুক্ত বাজার বা সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ বা নারীবাদের মতো ধারণা এবং প্রতিষ্ঠানের সমগ্র প্যাকেজ ছিল।

তৃতীয়ত, জ্ঞান সঞ্চালনের প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে এই স্বীকৃতি। উপনিবেশবাদ এবং উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধের সময় পশ্চিমা/আধুনিক আদর্শিক প্রভাবের প্রকৃতি ছিল সরাসরি রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত - মধ্যবিত্ত বা বর্ণ-বিরোধী সমাজ সংস্কারক, জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট বা আদিবাসীদের। তারা ইতিহাস তৈরি করতে চেয়েছিল, একটি স্বতন্ত্র পরিচয় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিল। নারী আন্দোলনের সাথে জড়িতদের জন্য, এটি প্রায়শই অস্বীকার হিসাবে প্রকাশ করা হত। 'আমি নারীবাদী নই' এমন একটি বিবৃতি ছিল যা প্রায়শই জনসাধারণের কাছে পরিচিত নারীদের কাছ থেকে শোনা যেত, যা আমাদের আত্ম-সংজ্ঞা অনুসারে চলা উচিত নাকি সমাজে তাদের কর্মকাণ্ড এবং পরিণতি মূল্যায়ন করে এই প্রশ্নের জন্ম দেয়।

চতুর্থত, অতএব, নারীবাদ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তা স্বীকার করতে সময় লেগেছে, বিশেষ করে কারণ পার্থক্য প্রকাশের এই প্রচেষ্টাগুলি এমন একটি প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হচ্ছিল যা পার্থক্যের ভাষা বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বৈধতা দ্বারা অবগত ছিল না। 'লিঙ্গ গঠন', 'কার্যক্ষমতা', 'পিতৃতন্ত্র' এবং 'অন্তর্বিভাগীয়তা' ধারণাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহ্বা এবং কলমের ডগায় চলে আসে, এক শতাব্দী আগেও বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কেবল অতীতের দিকে তাকালেই বেশিরভাগ ভারতীয় নারীবাদী বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা ছিলেন আন্তঃবিভাজন বিশ্লেষক।

> ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাগুলি পাঠদান

দীর্ঘকাল ধরে, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান পশ্চিমাদের দ্বারা সৃষ্ট ধারণাগুলি এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অবিরামভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং, যদিও আধুনিকীকরণ কাঠামো কয়েক দশক ধরে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তবুও এমন ধারণাগুলি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল যা স্ব-সৃষ্ট বলে মনে করা হত। আমি অনেক সেমিনারের কথা মনে করতে পারি, যেখানে সংস্কৃতীকরণকে খাঁটি ধারণা তৈরির উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হত; এবং যেখানে নারীবাদী এবং বর্ণ-বিরোধী প্রশ্ন, পূর্ববর্তী মার্কসবাদী প্রশ্নগুলির মতো, একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে দেখা হত।

আমার সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে, আমরা আধুনিকীকরণ সম্পর্কে শিখেছিলাম যে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় বিকশিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। আমরা আরও পড়েছিলাম যে, এক ধরণের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আছে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমরাও এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করব যা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির সাথে সমান্তরাল হবে, যা শেষ পর্যন্ত সমাজের বিশ্বব্যাপী একত্রিতকরণের দিকে পরিচালিত করবে। উপনিবেশবাদকে ভুলে যাওয়া হয়েছিল। এটা এমন একটি দেশে একটু অদ্ভুত ছিল যেখানে আমরা দাদাভাই নাওরাজি (১৮২৫-১৯১৭) এবং তার 'Poverty and Un-British Rule in India' বইটি সম্পর্কে জেনে বড় হয়েছি, যা অসম উন্নয়নের প্রাথমিক সমালোচনা এবং ভারতীয় 'সম্পদ নিষ্কাশন' তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সুতরাং, যখন অবোন্নয়ন তত্ত্ব এবং আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক পরিচিত হয়েছিল, তখনও তারা একটি বৃহৎ কাঠামোগত ক্রিয়াবাদী কাঠামোর সংযোজন ছিল, যা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের মডেল হিসেবে কাজ করেছিল।

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের মূল বিষয় ছিল 'ঐতিহ্যবাহী কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য' এবং 'উন্নয়ন' এর মধ্যে সামঞ্জস্য/অসঙ্গতি। আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমে আধুনিকীকরণ নগরায়নের দিকে পরিচালিত করলেও, ভারতে ব্রিটেন থেকে উৎপাদিত পণ্যের প্লাবনের সাথে তাঁত শিল্পের ধ্বংসের ফলে তাঁতিরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, যারা তখন গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রসমূহে প্লাবিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্যারিবীয়, অথবা ব্রিটিশ, ডাচ এবং ফরাসি গায়ানার মতো দূরবর্তী দেশগুলিতে চিনি এবং তুলা বাগানে কাজ করা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অংশ হয়ে ওঠে। যখন আমি ভারতে আধুনিকীকরণ পড়াতে শুরু করি, তখন আমাকে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার সেই অনুসন্ধান থেকে সরে আসতে হয়েছিল এবং গল্পের ধরণকে জটিল করতে হয়েছিল; এবং ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে আধুনিকতার সাথে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মোকাবেলা করতে হয়েছিল। একজনকে বিমূর্ত তত্ত্ব থেকে ইতিহাসে সরে যেতে হয়েছিল, অনেকটা নারীবাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতার মতো।

> চূড়ান্ত নোট

এটি কেবল পিছনের দিকে তাকিয়েই বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক বিবরণের আশ্রয় আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন এবং গ্লোবাল সাউথের ইতিহাস কেন তত্ত্বের ইতিহাস ছিল। আমাদের গল্পগুলি বিদ্যমান তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, কারণ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং চিন্তাভাবনা মূলধারার সমাজবিজ্ঞানে লুকিয়ে ছিল। যদিও গুঞ্জন এবং দখলের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, বিউপনিবেশায়ন আমাদের কথা বলার ভাষা প্রদান করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: মৈত্রেয়ী চৌধুরী <maitrayeec@gmail.com>

অনুবাদ:
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

> দক্ষিণ ভারতে সমাজবিজ্ঞান

ইন্দিরা রামারাও, ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি এবং ভারতের মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি, ভারত

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দক্ষিণ ভারতে সমাজবিজ্ঞানের সূচনা হয়। এ অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসকে ১৯০০-১৯৫০, ১৯৫০-২০০০ এবং ২০০০-২০২৪ (আজ অবধি, লেখার সময়কাল অবধি) তিনটি সময়কালে বিভক্ত করা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, এই পাঁচটি প্রদেশ এই অঞ্চলের আওতাভুক্ত।

> ১৯০০-১৯৫০

১৯১৫ সালে কেমব্রিজের অর্থনীতিবিদ গিলবার্ট স্লেটার যখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন, তখন থেকেই সামাজিক ঘটনাবলী বোঝার জন্য সমাজতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। স্লেটার বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা যখন সমাজকে বিশেষকরে গ্রামীণ সম্প্রদায়কে বুঝতে শিখবে তখনই তাদের অর্থনীতির শিক্ষা পরিপূর্ণ হবে। ১৯১৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক " দক্ষিণ ভারতীয় কিছু গ্রাম" নামে ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কিত তার একটি গবষণা প্রকাশিত হয়েছিলো। আমি এটিকে এমন এক ভিত্তি হিসেবে দেখি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আজকের আন্তঃবিষয়ক ও বহুবিষয়ক অধ্যয়ন গড়ে উঠেছে।

এ ধরনের আরেকটি উদ্যোগের সূচনা হয় ১৯১৭ সালে, যখন এ.আর. ওয়াদিয়া মুম্বাইয়ের উইলসন কলেজ থেকে মহারাজা'স কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান হিসেবে মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান । দর্শন অধ্যয়নে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আনার প্রতি ওয়াদিয়ার প্রবল আগ্রহ ছিলো,তিনি মনে করতেন সমাজবিজ্ঞান স্নাতকস্তরের সামাজিক দর্শন পাথ্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালটির তৎকালীন উপাচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলও সমর্থন করেছিলেন আর সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে এগিয়ে নিতে ওয়াদিয়ার এই সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯২৮ সালে ভারতে প্রথমবারের মতো স্নাতক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম চালু হয়। দক্ষিণ ভারতের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল ১৯৪৯ সালে এক বছরের স্নাতকোত্তর কর্মসূচি চালু হওয়া।

হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের স্নাতক কোর্স প্রথমে অর্থনীতি বিভাগের অধীনে ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিভাগটি নিজস্ব পরিচয় দাড় করাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে, ১৯৪৬ সালে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হওয়ার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ বিভাগের মর্যাদা পায়। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময়, দক্ষিণ ভারতে কেবলমাত্র মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালাত।

যদিও কেরালা রাজ্যে ১৯৩০-এর দশকে সমাজবিজ্ঞানের পাঠদান শুরু হয়, তবে তা কলেজের অর্থনীতি, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের একটি সহায়ক বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো । উল্লেখ্য যে, সেই সময়ের সকল কলেজসমূহ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গবেষণাক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই অস্ট্রিয়ান নৃতত্ত্ববিদ ক্রিস্টোফ ফন ফিউরার-হাইমেনডর্ফ-এর নাম, যিনি ১৯৪৫ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক অধ্যাপক এবং নিজাম সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আগমনের ফলে শুধুমাত্র ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণির সূচনা হয়নি, বরং রাজ্যের বিস্তীর্ণ আদিবাসী অঞ্চলে গবেষণামূলক কাজও ব্যাপকভাবে শুরু হয়। চেঞ্চু, ভিল এবং রাজ গন্ড জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণাগুলো বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলো।

> ১৯৫০-২০০০

দক্ষিণ ভারতের সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ সময়। এই সময়ে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি গবেষণার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ উভয় স্তরেই সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা কর্মসূচি চালু করা হয়েছিলো, একইসাথে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছিলো।

১৯৫০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কর্ণাটকের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের কর্মসূচি চালু হয়। তৎকালীন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত যে কলেজগুলো ছিলো সেখানেও সমাজবিজ্ঞানকে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। ১৯৭০ সালে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (ICSSR)-এর অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল চেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কর্ণাটকের সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে।

অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে সমাজবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু হয় সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া, তামিলনাড়ুর দশটি প্রতিষ্ঠানেড়্যাদের মধ্যে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি বেসরকারি কলেজ এবং একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানেড় সমাজবিজ্ঞানের পাঠদান হত। ১৯৯৩ সালে পন্ডিচেরীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

কেরালা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির উপস্থাপন করেছিলো। এখানে কলেজ পর্যায়েই স্নাতকোত্তরে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম চালু হয়েছিল,

>>

> “ভারতীয় সমাজ নিয়ে অগ্রণী গবেষণা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের সমাজবিজ্ঞান বিভাগগুলোতে”

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় মাত্র ১৯৬৯ সালে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে সকল কলেজে সমাজবিজ্ঞান পাঠদান করানো হতো, সেখানে তারা একটি শক্তিশালী গবেষণাসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো, যা সাধারণত স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কেরালার আত্মীয়তা বিষয়ক এক পথপ্রদর্শক গবেষণা হিসেবে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও তিরুবনন্তপুরামের লয়োলা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জোসেফ পুথেনকালামের মনোগ্রাফ *Marriage and Family in Kerala* -কে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

১৯৫০-এর দশকের শুরুতে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভারতীয় সমাজ নিয়ে একাধিক গবেষণা শুরু হয়, যা সমাজ গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো। গ্রামীণ সমাজ নিয়ে মনোগ্রাফ রচনার ধারা যিনি সূচনা করেন, সেই শ্যামাচরণ দুবে ১৯৫২ সালে হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেন। সেকেন্দ্রাবাদ শহরের নিকটবর্তী শামীরপেট গ্রামকে ঘিরে তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত Indian Village গ্রন্থটি দক্ষিণ এশিয়ায় একটি মাত্র গ্রাম নিয়ে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৫৪ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক মিল্টন সিঙ্গারকে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর নিয়ে গবেষণার জন্য ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানায়। মাদ্রাজ শহরের শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যের ভূমিকা এবং নগর জীবনে সংস্কৃত ঐতিহ্যের অবস্থান নিয়ে তাঁর গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় ক্লাসিক গ্রন্থ *When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological Approach to Indian Tradition*| এছাড়া, বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত অবস্থায় এম. এন. শ্রীনিবাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *Marriage and Family in Mysore* (১৯৪২) এবং *Religion and Society among the Coorgs of South India* (১৯৫২)।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে কর্ণাটকের বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান বিভাগে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক সমস্যাভিত্তিক একাধিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের সুপারিশ প্রদান। গ্রামীণ দরিদ্র, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিয়ে সি. পার্বতাম্মার গবেষণাড়সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ‘সামাজিক পরিবর্তনের জন্য গবেষণা’ ধারণাটি কীভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

১৯৫০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটেড়বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম ও শিক্ষাদানও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। তবে ২০০০ সালের পর উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের বদলে বেসরকারি খাতে চলে যাওয়ায় সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে চাহিদা ও গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

> ২০০০-২০২৪

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে একবিংশ শতকে বহু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে এর বেশিরভাগই বেসরকারি খাতে। এমনকি নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ বা গুরুত্ব কমে গেছে। কর্ণাটক এই প্রবণতার একটি ক্লাসিক উদাহরণ। এই সময়ে রাজ্য সরকার ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেও, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে মাত্র ৯টিতে। অন্যদিকে, ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বেসরকারি খাতে ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয় মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানে। একই সময়ে অন্ধ্র প্রদেশে ৪৯টি এবং ২০১৪ সালে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে পৃথক হওয়া তেলেঙ্গানায় ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, তবে এই দুটি রাজ্যে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয় মাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তামিলনাড়ুতে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটিতেই সমাজবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কেরালাতেও ২০০০ সালের পর গঠিত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয় না। তবে ইতিবাচক দিক হলো, স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলোতে এখনো সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি

> শেষ কথা

দক্ষিণ ভারতের সমাজবিজ্ঞানের গতিপথ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যেগুলো নিয়ে এখনই গঠনমূলক আলোচনা হওয়া জরুরি। প্রথমত, এই বিষয়ে দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস সঠিকভাবে ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড হয়নি। সমাজবিজ্ঞানের উত্থান-পতনের কারণ ও এর বিকাশের ধরণ নিয়ে কোনো সুসংগঠিত তথ্য নেই। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং সেসব গবেষণার ফলাফল নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত। নিঃসন্দেহে অনেক বিভাগের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে, তবে এসব গবেষণার যথাযথ নথিভুক্তি, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ও দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণের চেষ্টা প্রায় নেই বললেই চলে। পিএইচডি গবেষণার পেশাগত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, অধিকাংশ কাজ এখনো শুধু ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য সীমাবদ্ধ, যেখানে কোনো গভীর পর্যালোচনা বা সমালোচনা হয় না। শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও গুণগত মান নিরীক্ষণ নিয়ে গভীর ও কার্যকর আলোচনা অপরিহার্য। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ইন্দিরা রামারাও<ramaraoindira@gmail.com>

অনুবাদ:
ড. তৌহিদ হোসেন খান, সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

> ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে নারী:

নারীবাদী অবদান, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রচলিত প্রথা

আরভিন্দার আনসারি, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তন ঔপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলো জ্ঞান সৃষ্টির নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে সমর্থন করেছে, যা প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং ইউরো কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরন্তু, এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলো প্রায়শই বিকল্প জ্ঞানের পদ্ধতিগুলোকে বাদ দিয়েছে এবং ছোটখাটো দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই প্রভাবশালী কাঠামোর মধ্যে, নারীরা জ্ঞান উৎপাদক বা তাত্ত্বিক হিসেবে নয় বরং সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের ভূমিকা পরিবার, আত্মীয়তা, প্রজনন ও সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তাদের বাস্তব জীবনটা সমাজবিজ্ঞানের ডেটা হিসেবে পরিণত হয়েছে। যদিও নারীদের অভিজ্ঞতা একাডেমিক বিষয় হিসেবে দৃশ্যমান হয়েছে, তারপরও নারী সমাজবিজ্ঞানীদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে অদৃশ্যই থেকে গেছেঃ এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং স্বীকৃতি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে থাকে। এটি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, এই বিচ্ছিন্ন থাকা ঘটনাক্রমে নয় বরং গভীর কাঠামোগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বর্জনকেই ফুটিয়ে তোলে, যা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের অবস্থা প্রকাশ করে। এই সমস্যাগুলো বোঝার জন্য, আমাদের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোর ইতিহাস পুনঃপরীক্ষা করতে হবে এবং নারীবাদী হিসেবে পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলো বিকাশের জন্য অপরিহার্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত করা যায়।

এই প্রবন্ধটিতে নারী সমাজবিজ্ঞানীদের রূপান্তরকারী প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে নারীদের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এটি শিক্ষণ পদ্ধতি, পদ্ধতিবিদ্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান পর্যালোচনা করবে এবং এটি করতে গিয়ে নারীরা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারনা ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছে সে বিষয়টি আলোচনা করা হবে। আমি নীরা দেশাই, বীণা মজুমদার, মৈত্রেয়ী কৃষ্ণরাজ, সুজাতা প্যাটেল, মৈত্রেয়ী চৌধুরী ও শর্মিলা রেগের মতো চিন্তাবিদদের অগ্রগামী ধারণাগুলো আলোচনা করবো, যারা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানতত্ত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিবিন্যাসকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই পণ্ডিতরা সমাজবিজ্ঞানের একটি নারীবাদী বিকল্প মতবাদের পক্ষে সমর্থন করেন, যা প্রতিফলনশীলতা, জ্ঞানতাত্ত্বিক বহুত্ববাদ এবং আন্তঃসংযোগবাদ অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করে। সুতরাং, আমি মনে করি যে নারীদের অবদান কেবল সম্পূরক নয় বরং তারা সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির বিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করেছে।

> পুরুষকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্রগামী সমালোচনা নারীদের পদ্ধতিগত প্রান্তিকীকরণকে উন্মোচন করেছে

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে নারীবাদী সম্পৃক্ততার উত্থান সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির প্রাথমিক জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। শুরুর বছরগুলোতে, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান - যেমন ভিলেজ স্টাডিজ, জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস, আত্মীয়তার ধরন ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি মগ্ন ছিল - এমন ক্ষেত্রগুলো যা প্রায়শই নারীদের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করত এবং ধারণাগত কাঠামো থেকে লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণকে বাদ দিয়েছিল। নারীবাদী পণ্ডিতদের মাধ্যমে, লিঙ্গকে ভিত্তি ধরে এই বাদ পড়া বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানীয় বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এটি সমাজবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু এবং গবেষণা পরিচালনার পদ্ধতি উভয়কেই পরিবর্তন করেছে।

প্রাচীনতম অগ্রগামীদের মধ্যে, ইরাবতী কর্ভের আত্মীয়তা এবং পারিবারিক জীবনের উপর যুগান্তকারী গবেষণা নৃতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতার সাথে কঠোর সামাজিক তত্ত্বকে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছিল, যা ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর একটি অধিক সূক্ষ্ম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বোঝাপড়ার অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছিলো। এর উপর ভিত্তি করে, পণ্ডিতরা ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে উইমেন স্টাডিজ-এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টা ১৯৭৪ সালে ভারতে নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি" প্রতিবেদন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং নারী আন্দোলন দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। এটি পুরুষকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্বের সমালোচনা করে নারীবাদী পাণ্ডিত্যের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত স্থান তৈরি করেছিল এবং সমাজবিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষায় নারীদের পদ্ধতিগত প্রান্তিকীকরণকে সকলের সামনে তুলে ধরে।

> শিক্ষণ এবং গবেষণায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়

ভারতের নারীবাদী পণ্ডিতরা প্রভাবশালী জ্ঞানতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনশীলতা ও আন্তঃসংযোগবাদের উপর ভিত্তি করে রূপান্তরকারী শিক্ষণ পদ্ধতির অগ্রগতি সাধন করে সমাজবিজ্ঞানীয় অনুসন্ধানকে পুনর্গঠন করেছেন। এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজ গবেষণা কেন্দ্রে মৈত্রেয়ী কৃষ্ণরাজের নেতৃত্ব শিক্ষণ ও গবেষণায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি জ্ঞানের সহ-উৎপাদনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ছাত্র এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিল। বীণা মজুমদার উইমেন

>>

১২

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন এবং শিক্ষায়তনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন। সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিক্ষা এবং গবেষণা উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়ন করেছিল এবং নারীবাদী পাণ্ডিত্যে তাদের অভিজ্ঞতাকে অগ্রভাগে নিয়ে এসেছিল। নীরা দেশাই ১৯৭৪ সালে এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রথম স্বায়ত্তশাসিত উইমেন স্টাডিজ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে নারীবাদী শিক্ষণ পদ্ধতিকে আরও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছিলেন, নারীবাদী পাণ্ডিত্য ও সক্রিয়তার মধ্যে একটি সত্যিকার সংযোগ বজায় রেখেছিলেন।

শর্মিলা রেগে একটি সমালোচনামূলক শিক্ষণ পদ্ধতির অগ্রগতি সাধন করেছিলেন যা জাতি, শ্রেণি এবং লিঙ্গের বিভক্তিকরণকে অগ্রভাগে নিয়ে এসেছিল। পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রান্তি জ্যোতি সাবিত্রীবাই ফুলে উইমেন স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক হিসেবে, রেগের দলিত নারীদের আখ্যান ও সাক্ষ্যের ব্যবহার নারীবাদী তত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল। যা পদ্ধতিগত ধরনগুলোকে আরও বিস্তৃত করেছিল এবং মূলধারার সমাজবিজ্ঞান ও উচ্চজাতি নারীবাদী ধারনায় যে পৃথক করার চর্চা ছিল সেটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

সুজাতা প্যাটেল এবং মৈত্রেয়ী চৌধুরী নারীবাদী শিক্ষণ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিশেষত পদ্ধতিগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে প্রতিফলনশীলতার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে। চৌধুরী, তার প্রভাবশালী গ্রন্থ দ্য প্র্যাকটিস অব সোশিওলজি-তে, শ্রেণীকক্ষের স্থানগুলোকে সমর্থন করেন যা আত্ম-প্রতিফলনকে উৎসাহিত করে এবং প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে। তার পদ্ধতি বহুত্ববাদের উপর জোর দেয় এবং ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের সমালোচনামূলক উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। প্যাটেলের মতামতগুলোও একইভাবে প্রতিফলনশীলতা, আন্তঃশৃঙ্খলাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রূপান্তরকারী শিক্ষার উপর জোর দেয়। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের সমালোচনার মাধ্যমে প্যাটেল ইউরোকেন্দ্রিক কাঠামোর প্রাধান্যকে তুলে ধরে এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণকে মুখ্য করে তোলে। প্যাটেলের নারীবাদী শিক্ষণ পদ্ধতি জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস ভেঙে ফেলার জন্য বলে যাতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত জ্ঞান উৎপাদন সম্ভব হয়।

> জ্ঞানকে প্রাসঙ্গিকীকরণ এবং বিভক্তিকরণগুলো উন্মোচন

ডোনা হারাওয়ের স্থানীয়/প্রেক্ষিত জ্ঞানের ধারণা বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার মিথ্যা দাবিকে সমালোচনা করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে জ্ঞানতত্ত্বের আহ্বান জানায়। ভারতে, শর্মিলা রেগে দলিত নারীদের সাক্ষ্য নিয়ে কাজের মাধ্যমে এই কাঠামোকে কার্যকর করেছিলেন, দলিত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানতত্ত্বের অগ্রগতি সাধন করেছিলেন এবং মূলধারার সমাজবিজ্ঞান এবং উচ্চজাতি নারীবাদী বক্তৃতা উভয়কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, এই মর্মে জোর দিয়ে যে জাতি, শ্রেণি এবং লিঙ্গকে নিপীড়নের সহ-গঠনমূলক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

কিম্বার্লে ক্রেনশ'র প্রথম ধারণাকৃত আন্তঃসংযোগবাদ ভারতীয় নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক ও পদ্ধতিগত কাঠামো হয়ে উঠেছে। সুজাতা প্যাটেল ও মেরি ই. জন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম এবং অঞ্চলের নির্দিষ্ট বিভক্তিকরণগুলো সমাধানের জন্য এর প্রয়োগকে প্রসারিত করেছেন। প্যাটেল ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ঔপনিবেশিক এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভিত্তিগুলোর সমালোচনা করেন, বর্জনীয় করে রাখার চর্চাগুলোকে উন্মোচন করেন যা বিভক্তিকরণ পদ্ধতিগুলো ভেঙে ফেলতে চায়। একইভাবে, মেরি ই. জন বিভক্তিকরণ বিশ্লেষণ করেন এই দেখার জন্য যে পিতৃতন্ত্র, জাতিগত ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা এবং নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন

> "জ্ঞানকাণ্ডটির ভিত্তি নির্মাণে নারীদের অবদান অত্যন্ত মৌলিক"

সব একসঙ্গে কীভাবে কাজ করে। তিনি এই জটিল ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে সচেতন নারীবাদী রাজনীতির আহ্বান জানান।

> নারীবাদী তত্ত্বকে সামাজিক বলয়ে স্থাপন

গেইল ওমভেদ ও কমলা ভাসিন নারীবাদী প্র্যাক্সিসকে শিক্ষায়তনের বাইরে সম্প্রসারিত করেছেন, নারীবাদী পদ্ধতিগুলোকে তৃণমূল আন্দোলন ও সম্প্রদায় শিক্ষণ স্থানে নিয়ে এসেছেন। ওমভেদ পণ্ডিত ও সক্রিয়তাবাদীর মধ্যে বিভাজন রেখাকে অস্পষ্ট করেছেন নারীবাদী তত্ত্বকে দলিত এবং গ্রামীণ নারী আন্দোলনের সাথে একীভূত করে, অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ও সম্মিলিত ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়ে। অংশগ্রহণমূলক ক্রিয়া গবেষণার উপর তার কাজ জ্ঞান উৎপাদনের ঐতিহ্যগত শ্রেণিবিন্যাসকে বিঘ্নিত করে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলোকে সহ-গবেষক হিসেবে স্থাপন করেছে। কমলা ভাসিন তার নারীবাদী শিক্ষাগত উদ্যোগ এবং হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ার্কি? ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং জেন্ডার এর মতো লেখনীর মাধ্যমে নারীবাদী জ্ঞানকে গণতান্ত্রিক করেছেন। গল্প বলা, গান ও সংলাপের মাধ্যমে, ভাসিন গ্রামীণ ও শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে সম্মিলিত শিক্ষা এবং চেতনা-জাগরণকে উৎসাহিত করেছেন, সাথে নারীবাদী তত্ত্বকে তৃণমূল পর্যায়ে সহজলভ্য করে তুলেছেন।

সম্মিলিতভাবে, এই নারীবাদী পদ্ধতিগুলো অংশগ্রহণমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নৈতিকভাবে সম্পৃক্ত গবেষণা অনুশীলনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা প্রতিফলনশীলতা, স্থানীয় জ্ঞান ও আন্তঃসংযোগবাদ উৎসাহ দিয়ে পজি-টিভিস্ট এবং বিচ্ছিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। গীতা চাড্ডা ও মৈত্রেয়ী চৌধুরীর প্রস্তাবিত প্রতিফলনশীলতা গবেষকদের তাদের অবস্থান এবং জ্ঞান উৎপাদনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কগুলোকে যাচাই করার আহ্বান জানায়। পিয়ের বোর্দিয়ুর প্রতিফলনশীল সমাজবিজ্ঞানের ধারণার উপর ভিত্তি করে, নারীবাদী পণ্ডিতরা গভীরতর আত্ম-প্রতিফলনের পক্ষে সমর্থন করেন। এর মাধ্যমে তারা গবেষককে তাদের অধ্যয়নকৃত সামাজিক বিশ্বের মধ্যে স্থাপন করে এবং বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষতার দাবিগুলোকে ভেঙে ফেলেন। এই পদ্ধতিগুলো জ্ঞান উৎপাদনকে ঔপনিবেশিকীকরণ থেকে মুক্ত করার এবং পাণ্ডিত্যকে সামাজিক রূপান্তরের সাথে সংযোগকারী প্র্যাক্সিসকে উৎসাহিত করার উপর জোর দেয়।

> নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে

যদিও নারীরা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখে চলেছেন, তথাপি প্রতিষ্ঠানগত পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে তাঁদের গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ প্রায়শই অদৃশ্য বা প্রান্তিক করে তোলা হয়। চৌধুরী বলেন, এই লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস নেতৃত্বের অবস্থান ছাড়িয়ে জ্ঞান উৎপাদন ও প্রচারের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। নারীদের গবেষণা-বিশেষত যখন তা নারীবাদী তত্ত্ব, জাতপাত ও প্রান্তিকতা নিয়ে কাজ করে-প্রায়শই অবমূল্যায়িত হয় বা "উইমেন স্টাডিজ" বিভাগে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, মূল সমাজবিজ্ঞান চর্চার অংশ হিসেবে রাখা হয় না। মৈত্রেয়ী চৌধুরী এই জ্ঞানগত বর্জনের সমালোচনা করে বলেন, নারীবাদী

>>

অন্তর্দৃষ্টি প্রায়শই পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হয়, মূল বিশ্লেষণ কাঠামোর কেন্দ্রে নয়।

ভারতে নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান আজ এক জটিল ও আন্তঃসংযুক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যা উদারনৈতিক বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তেজনার দ্বারা প্রভাবিত। গিগ অর্থনীতি ও প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক শ্রমের প্রসার প্রান্তিক ও অনিরাপদ শ্রমের নারীকরণকে আরও তীব্র করেছে, যা বিশেষভাবে দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু নারীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে-তাঁরা অনিরাপদ জীবিকা, মজুরি বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চনার শিকার। এই পরিস্থিতি, ডিজিটাল বিভাজনের দ্বারা আরও জটিল হয়ে উঠেছে, যা জাত, শ্রেণি ও লিঙ্গের বিদ্যমান বিভেদকে আরও দৃঢ় করে এবং অর্থনৈতিক সুযোগে সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারকে সীমিত করে। একইসাথে, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায়শই প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সুবিধা নিশ্চিত করে। ফলে প্রান্তিক নারীদের জন্য নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জনপরিসরে প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হয়।

বিনা আগরওয়াল ও বন্দনা শিবার মতো পণ্ডিতদের দ্বারা উল্লিখিত পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু-ঘটিত স্থানচ্যুতি - নারীদের দুর্বলতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত গ্রামীণ ও আদিবাসী নারীদের জন্য, যাদের সম্প্রদায়ের টিকে থাকা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের ভিত্তি গঠন করে মূলত তাদের শ্রম। এছাড়াও, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও রাজনৈতিক মেরুকরণের উত্থান ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যকে তীব্রতর করেছে, তাদের অধিকার ও নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এই আন্তঃসংযুক্ত চ্যালেঞ্জগুলো একটি নারীবাদী প্র্যাক্সিসের দাবি রাখে যা প্রতিফলনশীল, বিভক্তিকরণীয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় স্থানীয় ও বৈশ্বিক অসমতার কাঠামো উভয়কেই সমাধান করে।

> একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিফলনশীল শৃঙ্খলার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বহুত্ববাদকে গ্রহন এবং সামাজিকভাবে পাণ্ডিত্যকে উৎসাহিত করা

নারীবাদী গবেষকেরা ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, এর পৌরুষকেন্দ্রিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং এর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়গত ক্ষেত্র উভয়কেই সম্প্রসারিত করেছেন। স্থায়ী ও ক্রমবিকাশমান বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ধারাবাহিক অবদান এবং রূপান্তরমূলক হস্তক্ষেপ নারীদের জন্য প্রধান একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষত ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি (আইএসএস)-এ অধিক অন্তর্ভুক্তি ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করেছে।

ভারতীয় সমাজতত্ত্বে সাম্প্রতিক অগ্রগতি অর্থবহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয় এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতি নতুনভাবে অঙ্গীকার প্রকাশ করে। একটি মাইলফলক মুহূর্ত আসে ২০১৬ সালে, যখন সুজাতা পাটেলকে আইএসএস-এর প্রথম নারী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। যা একাডেমিক নেতৃত্বে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তার সভাপতিত্বের মেয়াদ পরবর্তী নারী নেত্রীদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়। যেমন প্রফেসর ইন্দিরা, প্রফেসর আভা চৌহান এবং প্রফেসর মৈত্রেয়ী চৌধুরী, যাদের সভাপতিত্ব এই অর্জনগুলোকে আরও সুসংহত করেছে। সম্মিলিতভাবে, তাদের নেতৃত্ব আইএসএস-এর গণতন্ত্রীকরণকে অগ্রসর করেছে, এর কাঠামোগত বৈষম্য মোকাবিলা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞানচর্চা প্রচারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

পাঠদান, গবেষণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় সমালোচনামূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারীবাদী গবেষকেরা আত্ম-প্রতিফলন, আন্তঃসংযোগবাদ এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোকে সামনে এনেছেন। যা সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নারী নেত্রীদের অবদান, বিশেষত আইএসএস-এর ভেতরে, এসব রূপান্তরমূলক প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবুও, ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে গণতান্ত্রিক করার কাজ এখনো একটি চলমান প্রকল্প। সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আত্ম-প্রতিফলনশীল শাস্ত্র গড়ে তুলতে হলে সব লিঙ্গের গবেষকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

পুরুষদের বাদ দিয়ে কেবল নারীবাদী ক্ষেত্র তৈরি করা নয়, বরং এমন সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেখানে বহুমাত্রিক কণ্ঠ একসাথে কাজ করে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ও ন্যায়সঙ্গত করে গড়ে তোলে। পুরুষ গবেষকদের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে প্রোথিত শ্রেণিকরণকে ভাঙতে এবং শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করতে পারে। বহুত্ববাদ গ্রহণ ও সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত জ্ঞানচর্চা প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব এমন এক ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারে, যেখানে নারীবাদী চিন্তা ও প্রয়োগ এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের কেন্দ্রে অবস্থান করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ অরবিন্দর আনসারি <arvinder2009@gmail.com>

অনুবাদ:
ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

> ভারতের প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন

নতুন ভাবনা

শ্রুতি তাম্বে, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

পশ্চিমা একাডেমিক জগতে সামাজিক আন্দোলনের সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিকাশ লাভ করে। ১৯৬০-এর দশকে এই সমাজতাত্ত্বিক শাখাটি বিশ্বব্যাপী, এমনকি ভারতের মতো দেশেও, বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক আন্দোলনের সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সময়কালে। তবে, ভাবনার বিষয় হল- উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের উত্থান এবং সফলতা, এবং সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা একই সময়ে বৃদ্ধি পাওয়া, এটা কি নিছক কাকতালীয়?

আমার যুক্তিতে উপনিবেশবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও বর্ণবৈষম্যবিরোধী অসংখ্য আন্দোলন ও প্রতিবাদ এই একটি নতুন শাখা অর্থাৎ সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞান নামক বিশেষ ক্ষেত্রটির জন্ম দিয়েছিল-যা প্রচলিত 'সামাজিক পরিবর্তন' ধারণার বাইরে গিয়ে চিন্তার প্রচলন করে। তবুও, এই ক্ষেত্রটি উপনিবেশমুক্তির সময়কালীন বাস্তব মাঠ পর্যায়ে দেখা কৌশল, মতাদর্শ, ও সংগঠনের ধরণগুলোকে আমলে নেয়নি বা অন্তর্ভুক্ত করেনি। যেন সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটি 'উপনিবেশাধীন বিশ্বে' ঘটে যাওয়া উন্নয়নধারা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল।

> পশ্চিমা উদার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে আধুনিক সর্বহারা আন্দোলন

আমি এখানে তিনটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে চাই, যেগুলো সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ছিল। এই প্রস্তাবনাগুলো একদিকে যেমন একাডেমিক স্বীকৃতির সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, অন্যদিকে তেমনি কিছু নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার বৈধতা প্রতিষ্ঠায়ও প্রভাব রেখেছে।

প্রথম প্রস্তাবনা হলো-সামাজিক আন্দোলন একটি আধুনিক প্রপঞ্চ। আধুনিকতার সব উপাদান-ভাবনা ও মূল্যবোধের রূপান্তর, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও প্রযুক্তি-এসবই সামাজিক আন্দোলনকে একটি নিখাদ আধুনিক প্রপঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। যদিও এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরুতে খুব ধীরগতির এবং অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল, তবে পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কিছু সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, যুক্তিবাদ, নতুন করে নান্দনিকতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে উৎসাহিত করার প্রবণতা আধুনিক বিশ্বে ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। এই রূপান্তরসমূহ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ডেকে আনে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই রূপান্তরের ধারা কি উপনিবেশিক বিশ্বেও বিরাজমান ছিল? সেই সময় গ্লোবাল সাউথে বর্ণবাদ কি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল?

> "বৈশ্বিক দক্ষিণ কোনো অভিন্ন শ্রেণি নয়"

দ্বিতীয়ত, এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক যৌথ কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ আধুনিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং উদার গণতন্ত্রের ভিন্নমতের ভেতরে নিহিত, যেগুলো পশ্চিমা পুঁজিবাদ দ্বারা গঠিত। এর ফলে কেবল পশ্চিমা অভিজ্ঞতাকেই 'আসল' বা 'প্রামাণ্য' হিসেবে ধরা হয়। ফলে কেবল পশ্চিমা অভিজ্ঞতাকেই এখানে একধরনের স্বতন্ত্রতা ও প্রামাণিকতা প্রদান করা হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক সম্মিলিত কর্মকাণ্ডগুলো বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত, যা মুলত পশ্চিমা উদার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ভিতরেই বিকশিত হয়েছে।

তৃতীয় প্রস্তাবনাটি এই সংগ্রামগুলোর নেতা এবং অনুসারীদের আলোচনার কেন্দ্রে রাখে। এই প্রস্তাবনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা হলো-সর্বহারারাই (proletariats) মুলত সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী শক্তি। এসব সংগ্রাম শ্রেণি সংঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং তার ফলস্বরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য চাপ তৈরি হয়।

এই তিনটি প্রস্তাবনা এবং বিভিন্ন ধারণাগত কাঠামো ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী গবেষকরা সামাজিক আন্দোলন নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা কাঠামোগত চাপ, বৈষম্য, জীবিকা হারানোর অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক মতভেদের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন।এই ধারা অনুসরণ করে ভারতসহ গ্লোবাল সাউথের বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের কৌশলসমূহ নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তা সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে।

> ভারতে ছয় দশকের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মূলধারায় স্থান পায়নি

ভারতে ১৯৮০-এর দশকে সামাজিক আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং আদিবাসী আন্দোলন নিয়ে গবেষণার জোয়ার দেখা যায়। বিশেষ করে ভূদান-গ্রামদান (ভূমি ও গ্রাম উপহারের) আন্দোলনের মতো কেস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলন এবং প্রতিবাদকে সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর ভিতরে নথিভুক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে একাধিক পিএইচডি গবেষণাও জমা পড়ে।

>>

তবুও, আন্তর্জাতিকভাবে এই শাখা জনপ্রিয় হওয়ার ছয় দশক পরেও, দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশেষত ভারতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ, সম্পদহীন মানুষের প্রতিবাদ, বিরোধিতা ও দাবি আদায়ের অভিজ্ঞতাগুলো মূলধারার সামাজিক আন্দোলন ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানে ঠিকভাবে ফিট হচ্ছে না কেন? এই চলমান জটিলতাকে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি? এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে কোনো প্রাসঙ্গিক কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে কী?

> ভারতজুড়ে আন্দোলনের ঢেউ সমাজবৈজ্ঞানিক বিতর্কের কেন্দ্রে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়

NAPM@30 একটি দলিল যা সফল ও ব্যর্থ-উভয় ধরনের সংগ্রামের কথা স্মরণ করে এবং উল্লেখ করে যে, ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে যখন এই জনঅভিন্যস্ত জোট (NAPM) গঠিত হচ্ছিল, তখন ভারতের উপর বিশ্বব্যাংক প্রবর্তিত 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট' প্রোগ্রাম চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই হস্তক্ষেপ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সরকারি অনুদান, কল্যাণমূলক প্রকল্প, ভর্তুকি এবং স্থায়ী চাকরির সুযোগকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবুও, NAPM@30 আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ১৯৮০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত ভারতের শাসক শ্রেণি এবং প্রান্তিক-শোষিত জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ সম্মতি-যদিও তা খুব স্পষ্ট ছিল না-গড়ে উঠেছিল। এই মৌখিক সম্মতির ভিত্তি ছিল কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি এবং সংবিধানিক মূল্যবোধভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রবল জোয়ার ওঠে, যা ব্যাপকভাবে ভারতীয় সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দাবি জানায়। এই আন্দোলনগুলোতে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য এবং সংবিধানের আওতায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিত। জমি পুনর্বণ্টন, গৃহহীনদের ঘর প্রদান, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ভর্তুকি, গরিবদের জন্য খাদ্যশস্যের ভর্তুকিসহ সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা ছিল কিছু প্রধান দাবি। এমনকি ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়েও বিশ্বাস করা হতো, ভারতকে সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রের পথে এগোতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার আন্দোলন, কর্মসূচি ও প্রচারণা গড়ে ওঠে এবং মিলিয়ে যায়। তবুও, ভারতের সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গনে সামাজিক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেতে ব্যর্থ হয়। তখনও ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা', 'গ্রামীন বনাম শহুরে' বিষয় এবং এর পাশাপাশি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণাগত ও উপাদানগত বিভিন্ন দিক।

>"নতুন" সংগ্রামগুলো উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং উপনিবেশিক পুঁজিবাদী ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যকার ব্যবধানকে প্রতিফলিত করে

তবে ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে গিয়ে সামাজিক আন্দোলনের এক নতুন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়-নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট (NSM) থিওরি, যা ১৯৬০-এর দশক থেকে পশ্চিমা উন্নত বিশ্বে যে 'নতুন' আন্দোলনগুলি দেখা যাচ্ছিল, সেগুলোর বিশ্লেষণ করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চিহ্নিত 'পুরনো' আন্দোলনের বিপরীতে, এই 'নতুন' আন্দোলনগুলো জীবনধারা, মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত ও প্রতীকী জীবনের রূপান্তরের ওপর জোর দেয়, বিশেষত পশ্চিমা উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে।

এই সময়ে ভারতীয় গণতান্ত্রিক মঞ্চে বহু গণআন্দোলন উঠছিল, যার মধ্যে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের জন্য আন্দোলন, চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ন্যায্য মূল্য ও জমির অধিকার দাবির আন্দোলন, এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদবিরোধী ও সম্পদ দাবির সংগ্রাম ছিল উল্লেখযোগ্য। সে সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়গুলো মুখ্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে শুরু করে এবং আয় ও ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জরুরি প্রয়োজন নাগরিক সমাজের আলোচনায় ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে। জীবিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন ও শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে মর্যাদা দাবি করা ছিল ১৯৮০-এর দশকের সাধারণ ঘটনা।

অন্য কথায়, একদিকে ভারতে বস্তুগত দ্বন্দ্ব, নাগরিকত্ব এবং মানব মর‍্যাদা নিয়ে আন্দোলন চলছিল, অন্যদিকে পশ্চিমা সমাজে এই ধরনের বেঁচে থাকার মৌলিক সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে গিয়েছিল; সেখানে এখন পরিচয়, জীবনধারা ও মূল্যবোধ ছিল মূল লড়াইয়ের বিষয়। আলাভি ও শ্যানিন (১৯৮২) যথার্থভাবেই যুক্তি দিয়েছেন যে ভারত পুঁজিবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের মাধ্যমে, যেখানেই মুলত উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অন্তর্নিহিত।

> উপেক্ষিত ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো

১৯৯০-এর দশক থেকে, সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণী-যাদের স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্র 'তফসিলভূক্ত জাতি-বর্ণ' (scheduled castes) মুলত দলিত হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিল-তাদের আন্দোলন, বনভূমি ও বনসম্পদে উত্তরাধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার দাবিতে আদিবাসী আন্দোলন এবং নারীদের আন্দোলনগুলো প্রধানত নয়া সামাজিক আন্দোলন (NSM) তত্ত্বের কাঠামোর মধ্য দিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এই ঘৰ্ঋণ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য কাঠামোটি শিক্ষাবিদরা যথেষ্ট সংশোধন ছাড়াই 'প্রয়োগ' করেছেন।

নতুন সহস্রাব্দে, যেখানে বস্তুগত অধিকারের অসমাপ্ত প্রতিবাদ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাবির সংগ্রাম মাঠে তীব্রভাবে চলছেই, সেখানে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন তত্ত্ব -যেমন আপেক্ষিক বঞ্চনার মাধ্যমে কার্যকরিতাবাদী ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে ঘৰ্ঋণ তত্ত্ব ব্যবহার করছেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলন অধ্যয়নে ১৯৮০-এর দশকে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো পরবর্তীতে ভারতীয় একাডেমিক মহলে উপেক্ষিত হয়েছে বলে প্রবীণ গবেষকরা অনিচ্ছাসহকারে স্বীকার করেন। অন্যদিকে, সক্রিয় কর্মীরা উল্লেখ করেন যে, মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত স্লোগান, এজেন্ডা এবং আন্দোলনের কৌশলগুলো একাডেমিয়াতে তেমন আলোচনা সৃষ্টি করতে পারেনি। এগুলো কেবল গুটিকয়েক শিক্ষাবিদদের কৌতূহল জন্মায়।

> গ্লোবাল সাউথ থেকে কিছু সমাপনী প্রশ্ন

আমাদের সমসাময়িক বিশ্ব আজ গণতান্ত্রিক বিরোধিতা, প্রতিবাদ এবং মতাদর্শগত লড়াইয়ে সজীব। তবে গ্লোবাল সাউথ থেকে তাকালে, অনেক সময় মনে হয়-এটা কি সত্যিই একই পৃথিবী, যেখানে আমরা সবাই বাস করি? গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্লোবাল সাউথও একরৈখিক বা একরকম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে #MeToo আন্দোলন, পরিচয়-নির্ভর LGBTQ আন্দোলন থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী খনি, শিল্প ও অবকাঠামোগত প্রকল্পের কারণে উচ্ছেদের প্রতিবাদ-কিছু ইস্যু সার্বজনীন, আবার কিছু ইস্যু শুধুমাত্র গ্লোবাল সাউথের নিজস্ব। এ এক বৈশ্বিক বাস্তবতা-সম্পদ, আয়, অধিকার এবং দায়মুক্তির দ্বন্দ্বে পূর্ণ।

>>

সুতরাং, উপসংহারে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো উত্থাপন করি: ভারতে সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞান কি তার ধারণাগত ও তাত্ত্বিক ভিত্তি উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম থেকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে সংগ্রামগুলো ব্রিটিশদের সাথে সহিংস সংঘাত থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অ-সহিংস কমিউনিটি-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? পশ্চিমা তত্ত্বে জাতীয়তাবাদকে যেখানে একটি সংকীর্ণ মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখা হয়, সেখানে গান্ধীয় নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদের অর্থ কি একই ছিল? সত্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে অহিংসার দর্শন, একটি মানবিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি-এই বিষয়গুলোকে গ্লোবাল সাউথের নতুন আধুনিকতার রূপ হিসেবে দেখা যায় না? তাহলে আমরা কি অতিমাত্রায় যান্ত্রিকভাবে পশ্চিমা তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করেছি ভারত ও গ্লোবাল সাউথের আন্দোলন বিশ্লেষণের সময়, এবং অজান্তেই কি একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে প্রাপ্ত ওরিয়েন্টালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি?

সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে হলে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত জরুরি। তবেই গড়ে উঠবে সমাজবিজ্ঞানের এমন একটি উপ-শাখা, যা বিচারসঙ্গত, বাস্তবতাসম্মত, এবং এটি গ্লোবাল সাউথের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: শ্রুতি তাম্বে <shruti.tambe@gmail.com>
অনুবাদ:
মোঃ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

> ফার-রাইট স্বাভাবিকীকরণ এবং র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম

সাব্রিনা জাজাক, ডেজিম ইনস্টিটিউট, জার্মানি; ইমানুয়েলে তস্কানো, গুলিয়েলমো মারকোনি বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি; এবং আন্না-মারিয়া মইথ, ডেজিম ইনস্টিটিউট, জার্মানি

সবাস্টিয়ান ক্রিস্টোফ গোলনাওয়ের তোলা ছবি, এআই দিয়ে সম্পাদিত।

বিশ্বজুড়ে বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের মূলনীতিতে ও মৌলিক মূল্যবোধে বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা এখনও বিরাজমান। যে রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আগে চরম ডানপন্থা বলে দূরে সরিয়ে রাখা হতো, এখন তা সাধারণ ও মূলধারার অংশে পরিণত হয়েছে। জাতিগত জাতীয়তাবাদ, কর্তৃত্ববাদ, অভিবাসীবিরোধী, নারীবিদ্বেষী ও বহুত্ববাদ-বিরোধী মতবাদ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে নিয়েছে।

চরম ডানপন্থী নেতারা এখন শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণির অংশ নয়, বরং তারা সাধারণ মানুষের আন্দোলন ও সামাজিক গণমাধ্যম প্রভাবকদের মাধ্যমেও সক্রিয়ভাবে জনমত গঠন করছে। বছরের পর বছর ধরে মূলধারার সঙ্গে একীভূত হওয়া ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই চরমপন্থী মতাদর্শ সমাজের প্রায় সব স্তরে প্রভাব বিস্তার করেছে তা এখন সাধারণ নাগরিক, নারী, পুরুষ ও শিশুদের মনেও গভীরভাবে গেঁথে গেছে। এর ফলে আমাদের সমাজ আজ এক প্রকার 'চরমপন্থায় মূলধারীকৃত' রূপ লাভ করেছে।

> 'র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম' ধারণা:

'গ্লোবাল ডায়ালগ' এর এই বিশেষ সংস্করণে আমরা চরম ডানপন্থার স্বাভাবিকীকরণের সাম্প্রতিক ও নতুন গতিপ্রকৃতি এবং তা ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উদার গণতন্ত্রগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করার আকাঙ্খা রাখছি। একইসাথে, গণতান্ত্রিক মিত্রতার বৈশ্বিক কাঠামোর উপরেও এর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, সেটাও আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি।

আমরা এই সংখ্যায় এমন কিছু বিশেষ প্রশ্নের দিকে নজর দিতে চাই যেমন, আগে যেসব বিষয় জাতিগত-জাতীয়তাবাদী ধারণা ও বক্তব্য মূলধারার বাইরে ছিল, সেগুলো কীভাবে ধীরে ধীরে মূলধারার কথোপকথনে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে, ব্যক্তিগত মনোভাব এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি ও আন্দোলনে জায়গা করে নিচ্ছে এবং তা কীভাবে সম্ভব হলো। আমরা র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম ধারণাটি ব্যবহার করে চরম ডানপন্থীদের কৌশল, ব্যক্তি বা মতাদর্শ বিশ্লেষণ না করে মূলধারাকেই কীভাবে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করা হবে।

'র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম' বলতে আমরা বুঝি একটি ঘনিষ্ঠ এবং বিস্তর স্থান থেকে বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নানা আদর্শ ও মতবাদের ছড়িয়ে পড়া ও তার সংমিশ্রণ। এই নেটওয়ার্কে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী নেতা, ডিজিটাল ফ্যাসিস্ট, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন, তৃণমূল আন্দোলন এবং সাধারণ ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ককে অসম মর্যাদাভিত্তিক কাঠামোর মাধ্যমে পুনর্গঠিত করছে।

এই ধারণা ব্যবহার করে আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখনো অনেকটাই উপেক্ষিত প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও আদর্শের ডি-নরমালাইজেশন বা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং প্রগতিশীল, গণতন্ত্রপন্থী ও বৈষম্যবিরোধী (যেমন: বর্ণবৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী) শক্তিগুলোকে মূলধারার বাইরে ঠেলে দেওয়া।

এই ভূমিকায় আমরা র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম ধারণাটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই এবং এটির আন্তর্জাতিক পরিণতি, সমতা ও উদার বহুবাদী গণতন্ত্রের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

>>

>অনুসন্ধান থেকে বিশ্লেষণ

আমরা যখন প্রথম 'র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম' ধারণাটি ২০২৩ সালে বার্লিনে জার্মান ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশনস রিসার্চ সেন্টার (ডেজিম) এবং আইএসএ আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৈরি করি, তখন আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈপরীত্যের উপর আলোকপাত করা।

আমাদের কাছে র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম ছিল মূলত একটি শৈল্পিক ও চিন্তানির্ভর উপস্থাপন একটি বিপরীতধর্মী শব্দযুগল, কারণ চরমপন্থা ও মূলধারা উভয়ই একে অপরের বিরোধী, কিংবা অন্তত এমন ধারণা যেগুলো সাধারণত সদৃশ না। কারণ, যা চরম, তা একসাথে মূলধারা হতে পারে না। আমরা সম্মেলনের নাম দিয়েছিলাম 'র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিমের খোঁজে'। সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান গবেষকদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কীভাবে মূলধারার ভেতরেই চরমপন্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে এবং এ প্রক্রিয়ার ঝুঁকি বা বিপদ কোথায়।

এখন আর আর শুধু অনুসন্ধানের যুগ নেই এখন সময় হয়েছে ক্রমশ চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়া সমাজের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করার, এবং বোঝার যে একদিকে যেমন চরম ডানপন্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক, বহুবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা ও শক্তিগুলো ক্রমশ মূলধারা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এই সংখ্যায় যাঁরা লেখালেখি করেছেন, তাঁদের লেখা এ বাস্তবতা প্রমাণে বিস্তৃত প্রমাণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

টেরি গিভেন্স চরম ডানপন্থার স্বাভাবিকীকরণ কীভাবে ঘটছে, তা তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষত তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পুরুষদের আত্মোন্নয়নমূলক নানা নেটওয়ার্ক যা 'ম্যানোস্ফিয়ার' নামে পরিচিত আদর্শিক সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তিনি দেখান, কীভাবে শরীর এবং পুরুষত্ব উন্নয়নের প্রক্রিয়া চরমপন্থায় ঝুঁকে পড়ার একটি কৌশলে পরিণত হচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় একটি বড় সংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও অংশ।চরম ডানপন্থার কর্মীরা এখন ফ্যাশনকেও একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে পরিচয় নির্মাণ, মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া, এবং মূলধারার সংস্কৃতির আড়ালে চরমপন্থী বর্ণনার স্বাভাবিকীকরণ ঘটাতে।

আন্দ্রেয়া গ্রিপ্লো দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চরম ডানপন্থার নান্দনিক কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে খোলামেলা সাবকালচারাল স্টাইল থেকে শুরু করে আজকের দিনের হাইপার-নরমালাইজড (অতিমাত্রায় স্বাভাবিক দেখানো) ফ্যাশন পর্যন্ত। এভাবে তারা রূপ-রীতিকে একটি রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ এবং সাংস্কৃতিক বৈধতা অর্জনের অস্ত্রে পরিণত করেছে।

সবশেষে, সুমিন কালিয়া তুলে ধরেছেন পাকিস্তানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চরম ডানপন্থা নাগরিক সমাজে হস্তক্ষেপ করছে। আর রবের্তো স্কারামুজ্জিনো ও চিচিলিয়া সান্তিল্লি বিশ্লেষণ করেছেন জনতাবাদী (Populist) শাসনব্যবস্থা কীভাবে নাগরিক সমাজের কাঠামো পুনর্গঠন করছে।

> ব্যক্তিভিত্তিক পরিবর্তনের দিকে আলোকপাত

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আলোচনায় নতুন কি আছে যা ইতোমধ্যে ডানপন্থা ও চরম ডানপন্থার সংগঠনের ওপর করা গবেষণাগুলোর থেকে আলাদা?

অনেক সংখ্যক গবেষণা ও প্রবন্ধ মূলত তাদের ওপর আলোকপাত করে যারা চরম ডানপন্থী দলগুলোকে ভোট দেয় (এরা মূলত পুরুষ, এবং সব ধরনের সামাজিক শ্রেণি থেকে আসে)। এই গবেষণাগুলো পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রগুলোতে চরম ডানপন্থার উত্থানের পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে যেমন: দ্রুত আধুনিকায়নের চাপ, সামাজিক বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিনিধিত্ব কাঠামোর পরিবর্তন, বহুস্তরীয় সংকট, যুদ্ধ এবং মহামারির প্রভাব।

স্বাভাবিকীকরণ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিগত জাতীয়তাবাদী আদর্শ সমাজের মূলধারায় জায়গা করে নিচ্ছে এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলোর ডানদিকে ঝুঁকে পড়া প্রবণতা ও তা গণতান্ত্রিক সমাজে কী প্রভাব ফেলছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল অনুসন্ধান সেটাই।

অনেক গবেষক ও লেখক মনে করেন, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ অনেক সময় বাইরের নয়, বরং ভেতর থেকেই আসে যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও আদর্শকে ব্যবহার করেই সেটিকে অপহরণ বা বিকৃত করা হয়। এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য হলো ভাষাগত পরিবর্তনের দিকে নজর দেওয়া। আগে যেসব শব্দ ও ধারণা কেবল ডানপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হতো, সেগুলো এখন মূলধারার কথাবার্তায় ঢুকে পড়েছে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হিসেবে গৃহীত হচ্ছে।

এই স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বিতর্ক ও সংস্কৃতির চরিত্র বদলে দিতে পারে, এবং জনপরিসরের কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। সামাজিক গণমাধ্যম এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।ভুল তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া এবং চরমপন্থী কণ্ঠগুলোকে আরও জোরালো করে তোলা, বিশেষ করে এখন যেহেতু ঘৃণামূলক বক্তব্যের ওপর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ আর কার্যকর নেই এখন আর সামাজিক গণমাধ্যম । এই পরিবর্তনের বাস্তব ফল দেখা যায় বিভিন্ন নীতিনির্ধারণেও যেমন শরণার্থী আইন কঠোর করা, সীমান্তে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ আরোপ, কিংবা লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের স্ব-নির্ধারণ অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ।

>অসম মর্যাদাভিত্তিক আদর্শ যেভাবে বৈষম্যমূলক পদক্রমকে বৈধতা দেয়

এই স্বাভাবিকীকরণ এখন চরম ডানপন্থা নিয়ে প্রচলিত অধ্যয়নকে ছাপিয়ে যায়–এটি গণতান্ত্রিক মূলধারার ভেতরে থাকা নানা ধরনের অভিনেতা ও তাদের ভূমিকার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম' ধারণাটি এই বিশ্লেষণগুলোর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে এবং এগুলোকে একত্রিত করেছে।এটি সমাজের প্রান্তিক চরমপন্থা থেকে মূলধারায় ঢুকে পড়াকে কোনো সরল পথ হিসেবে দেখে না। ফলে শুধু গণতান্ত্রিক আদর্শ, মূল্যবোধ ও চর্চাগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ ও ভেঙে ফেলা হচ্ছে না এগুলোকে ধীরে ধীরে মূলধারা থেকে সরিয়েও ফেলা হচ্ছে।

আমাদের দৃষ্টিতে র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম বলতে বোঝানো হয় এমন এক ঘনীভূত অন্তর্জাল, যেখানে নানা রকম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম যুক্ত যাঁরা সরাসরি চরম ডানপন্থী দলের সদস্য না হলেও, তাদের ভাষা, অবস্থান বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিল রেখে চলছেন, কিংবা সেদিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছেন, যা একসময় কেবল চরম রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এখানে মেইনস্ট্রিম (মূলধারা) বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় সামাজিক বাস্তবতা যেখানে সমাজের নানা পটভূমি ও অবস্থানের মানুষ, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা নানা ধরণের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী চরম ডানপন্থী মতাদর্শ, কার্যক্রম ও মনোভাবকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মেনে নিচ্ছেন, যুক্তি দিচ্ছেন, নিজেদের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন এবং স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করছেন।

>>

অন্যদিকে র‍্যাডিকালাইজেশন (চরমপন্থায় ঝুঁকে পড়া) বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষের মর্যাদার অসমতা নির্ভর এক আদর্শ জাতি, লিঙ্গ, চরম জাতীয়তাবাদ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসকে যুক্তিসহকারে আরও দৃঢ় ও বৈধ করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে, যদি আমরা কেবল চরমপন্থার নির্বাচনকেন্দ্রিক দিক, ডানপন্থী শক্তির সংগঠিত হওয়া, কিংবা মূলধারার কথাবার্তায় ভাষাগত পরিবর্তনের দিকেই মনোযোগ দিই তাহলে এই জটিল বাস্তবতার একটি বিকৃত বা অসম্পূর্ণ চিত্র তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বরং আমাদের দরকার এমন আন্তঃসম্পর্ক, দ্ব্যর্থতা, সীমানার ধোঁয়াশা এবং মতাদর্শগত মিশ্রণের দিকে দৃষ্টিপাত করা, যেগুলোর মাধ্যমে কাছের প্রতিবেশী, বন্ধু কিংবা আত্মীয়রাও কখন যেন অজ্ঞতা, ঘৃণা কিংবা সহিংসতার বাহক হয়ে ওঠে।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা আরও গভীরভাবে বুঝতে পারি কীভাবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তা, ব্যক্তি ও চর্চাগুলোকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া এবং তাদের অস্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত করা প্রক্রিয়াধীন হয়। এর ফলে উদার গণতন্ত্রের ওপর যে মৌলিক প্রভাব পড়ে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের ধারণা যেটা একসময় স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক জীবনের একটি সাংগঠনিক নীতি ছিল তা এখন সঙ্কুচিত হয়ে কেবলমাত্র কিছু ছোট ছোট দ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে; যেসব জায়গায় এখনও সম্মিলিতভাবে সাম্য, সংহতি ও আশার চর্চা টিকে আছে।

> স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কিছু পরিণতি

সাধারণ মানুষ অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে এবং তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সীমান্ত বন্ধ করা ও শরণার্থী গ্রহণে কঠোর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকায়, যাঁরা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছেন তাঁদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে তা তাদের পালানোর পথে হোক বা আশ্রয়ের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। শক্তিশালী শিল্পখাতের জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা উপেক্ষা করার ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু প্রভাবিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বন্দোবস্তগুলোও সংকটে রয়েছে। একসময় শান্তি ও ফ্যাসিবিরোধিতার ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি নিজের ভেতর এবং বাইরের উভয় দিক থেকে আসা রেডিকালাইজড মেইনস্ট্রিমের চাপ সহ্য করতে পারবে, তা এখন অনিশ্চিত। জাতিসংঘের মানবতাবাদী ধারণাগুলো অবজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ছে এবং তহবিল প্রত্যাহার করা হচ্ছে, যা বিশ্বজুড়ে মানবিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদ সাম্প্রতিক দশকগুলোতে গড়ে ওঠা বহুপাক্ষিকতা দুর্বল করে দিচ্ছে, যা বৈশ্বিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা ও পরিচালনার জন্য জরুরি। এটা স্পষ্ট দেখা যায়, বাণিজ্য, জলবায়ু, অভিবাসন ও নিরাপত্তা জোটের মতো ক্ষেত্রগুলোতে আলোচনায় বয়কট বা পূর্বে গৃহীত চুক্তি থেকে প্রত্যাহারে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সুরক্ষাবাদী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে বেশি শুল্ক আরোপ এবং বাণিজ্য যুদ্ধের (হুমকি) মাধ্যমে।

> গণতন্ত্রের নবায়ন ও পুনরাবিষ্কারের জন্য একটি গবেষণা কর্মসূচি

এগুলো কেবল কয়েকটি উদাহরণ, যেগুলো দেখায় কীভাবে তথাকথিত র‍্যাডিকালাইজড মেইনস্ট্রিম এর এই নতুন বাস্তবতা ইতিমধ্যেই মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সুরক্ষা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং দৃশ্যমানতাকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যদি আমরা মূলধারার এই চরমপন্থায় ঝুঁকে পড়া বন্ধ করতে এবং তা ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে আমাদের বিশ্বাস–এই প্রবণতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে আমাদের প্রয়োজন গভীরতর বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং আন্তঃদেশীয় তুলনামূলক গবেষণা। মূলধারা কীভাবে চরমপন্থার দিকে ধাবিত হয়, তা বোঝা আমাদের ভবিষ্যতে ডি-র‍্যাডিকালাইজেশন বা সেই মূলধারাকে চরমপন্থা থেকে ফিরিয়ে আনার ধারণা গঠনে সহায়তা করতে পারে। এর মাধ্যমে আমরা এমন আশার দিগন্ত খুঁজে পেতে পারি, যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, চর্চা ও সম্প্রদায়সমূহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত, পুনর্জীবিত এবং নবায়িত হয়।

এই দুই প্রবণতাচরম ডানপন্থার স্বাভাবিকীকরণ এবং গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের অপসারণ একত্রে ভবিষ্যতের গবেষণার দিকনির্দেশ নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে, যাতে আমরা ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের নবায়ন এবং নতুন রূপদানে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারি। ■

সরাসরি যোগাযোগ জন্যঃ সাব্রিনা জাজাক <zajak@dezim-institut.de>

অনুবাদঃ
ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> চরম ডানপন্থা থেকে মূলধারার ডানপন্থায়: ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর

টেরি গিভেন্স, ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

ডানপন্থী রাজনীতির বিকাশে মূল শব্দগুলো।
ছবি তৈরি করেছেন লেখক।

আমি ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে চরম ডানপন্থা নিয়ে গবেষণা শুরু করার পর থেকে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি-সেই সময়ে যেসব মতামত "চরম" বলে বিবেচিত হতো, এখন সেগুলো মূলধারায় পরিণত হয়েছে। যখন আমি এই বিষয় নিয়ে আমার প্রথম বই লিখছিলাম, তখন অনেক গবেষক আমাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন, কারণ তারা মনে করতেন চরম ডানপন্থী দলগুলো একদিনের ঝলক। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, এই দলগুলো এখন ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি স্থায়ী ও প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বই The Roots of Racism-এ আমি উল্লেখ করেছি, "ডানপন্থী রাজনীতি অভিবাসীদের কে রাষ্ট্র কাঠামোতে একটি বাইরের অনাহূত উপাদান হিসেবে তুলে ধরে এবং তাদেরকে সমাজে অপরাধ, বেকারত্বসহ নানা সমস্যার জন্য দায়ী করে।" যা এক সময় চরমপন্থা বলে বিবেচিত হতো, এখন তা অভিবাসনবিরোধিতা ও ইসলামভীতির মতো ইস্যুতে মূলধারার মতামতে রূপ নিয়েছে।

> বিস্ময়কর ডানপন্থী পরিবর্তন

১৯৮০-এর দশকে যখন চরম ডানপন্থী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে শুরু করে, তখন একটি অভিজাত পর্যায়ে ঐকমত্য গড়ে ওঠে-এটি ছিল করডন সেনিটেয়ার (প্রতিবন্ধকতা) নামে পরিচিত একটি রীতি, যার মাধ্যমে মূলধারার রাজনীতিকরা চরম ডানপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে অস্বীকৃতি জানাত এবং বামপন্থী ভোটারদেরকে মূলধারার প্রার্থীদের ভোট দিতে উৎসাহিত করত। কিন্তু এই ঐকমত্য ভেঙে পড়ে ৯/১১(নাইন/ইলেভেন)র পরে, যখন ইউরোপজুড়ে রক্ষণশীল সরকারগুলো ক্ষমতায় আসে এবং অভিবাসন ইস্যুতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে নিরাপত্তা বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ২০০০ সালে অস্ট্রিয়ার ফ্রিডম পার্টি (এফপিও) আংশিকভাবে সরকারের অংশ হয়। কারণ তারা ছিল প্রধান জোট সরকার ছাড়া একমাত্র বিকল্প। শুরুরদিকে সরকারে যোগ দেওয়ার ফলে দলটি কিছুটা সংযত হয়েছিল বলে মনে হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা আবার আগের চেয়ে আরও উগ্র অভিবাসনবিরোধী অবস্থানে ফিরে গেছে । যেহেতু অনেক চরম ডানপন্থী দল তৈরি হয়েছে এবং নির্বাচনে তারা ভালো ফল করেছে। ফলে এই অসংযত অবস্থান চলমান রয়েছে।

২০০০-এর দশকের শুরুতে অস্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টি, ড্যানিশ পিপল'স পার্টি ও অন্যান্য চরম ডানপন্থী দলগুলো যখন সরকারে জায়গা পায়, তখনই তাদের জন্য আরও বড় পরিসরে সাফল্যের পথ খুলে যায়। ২০১৪ সালের ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে এসব দলের প্রতি সমর্থন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, যা

>>

২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোটেরও পূর্বাভাস দেয়। এরপর ২০১৯ সালের নির্বাচনে এই সমর্থন আরও বাড়ে, যখন মারিন লে পেন-এর (র‍্যাসেম্বলেমেন্ট ন্যাশনাল পার্টি) প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর দলীয় জোটকে অল্প ব্যবধানে হারিয়ে ২৩% ভোট পায়। র‍্যাসেম্বলেমেন্ট ন্যাশনাল যা তার পুরনো রূপ ফ্রন্ট ন্যাশনাল-এর মতো একই আদর্শ ধরে রেখেছে যা বর্তমানে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ফরাসি জাতীয় সংসদের নিয়মিত একটি শক্তি হয়ে উঠেছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে যখন থেকে আমি রাজনৈতিক দল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি , ইউরোপের রাজনীতিতে একটি বিশাল ডানদিকে ঝুঁকে পড়ার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলোর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। চরম ডানপন্থা এখন আর প্রান্তিক কোনো বিষয় নয়-এটি এখন ইউরোপীয় রাজনীতির মূলধারার অংশ। এই পরিবর্তন বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই এই রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সামগ্রিক পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে।

> নির্বাচনী সমর্থন বৃদ্ধির মাধ্যমে এই শতকে ইউরোপের চরম ডানপন্থী দলগুলোর উত্থান

২০০০ সালের শুরু থেকে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে চরম ডানপন্থী দলগুলো সংসদ নির্বাচনে তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করেছে এবং স্পষ্টভাবে মূলধারার রাজনীতির অংশ হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সুইডেন ডেমোক্র্যাটসরা রিকসড্যাগে ৭৩টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে র‍্যাসেম্বলেমঁ ন্যাসিওনাল (আরএন) ২০২৪ সালের স্নাপ সংসদ নির্বাচনে ৩৭ শতাংশ ভোট পায়, যদিও বামপন্থি দলগুলোর কৌশলগত সমন্বয়ের কারণে প্রত্যাশিত সংখ্যক আসন পায়নি। জার্মানিতে, অল্টারনেটিভ ফিউর ডয়েচল্যান্ড (এএফডি) ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়ে ওঠে, যা ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় দ্বিগুণ।

২০২২ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে প্রথম স্থান লাভ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইতালির ব্রাদার্স অব ইতালি দলের নব্য-ফ্যাসিস্ট রাজনীতিবিদ জর্জিয়া মেলোনি জোট সরকার গঠন করার মতো ভোট পায় এবং মেলোনি প্রধানমন্ত্রী হন। নেদারল্যান্ডসে, গিয়ার্ট উইল্ডার্সের পার্টি ফর ফ্রিডম (পিভিভি) ২০২৩ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে সর্বাধিক আসন পায়, কিন্তু বিতর্কিত জোট আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ায় ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সরকার গঠন করতে পারেনি, যা একজন নিরপেক্ষ আমলা দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, হাঙ্গেরিতে ভিক্টর অরবান ২০১০ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছেন, এবং তার অসহিষ্ণু সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে।

> জনপ্রিয়তা, বর্ণবাদ এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি ভয়ের কারণে শ্রমজীবী শ্রেণির সমর্থন বৃদ্ধি

এতদিন পর্যন্ত চরম ডানপন্থি দলগুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হতো না, কিন্তু এখন তারা ক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। জাতি এবং অভিবাসন বিষয়ক রাজনীতির চারপাশে প্রচলিত মানদণ্ড স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে, যখন ডানপন্থি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। ১৯৯৯ সালে, যখন জোয়ের্গ হেইডারের ফ্রিডম পার্টি অস্ট্রিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য ১৪টি দেশ তার অভিবাসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী অবস্থানকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেছিল। যদিও তারা ভোটের ফল পরিবর্তন করতে পারেনি, তারা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল, যার মধ্যে ২০০০ সালে গৃহীত রেশিয়াল ইক্যুয়ালিটি ডিরেকটিভ (আরইডি) অন্যতম, যা বৈষম্যবিরোধী নীতির প্রতি সমর্থনের প্রতীক ছিল। ইউরোপের চরম ডানপন্থি দলগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং অভিজাতদের বিরুদ্ধে থাকার দাবিতে জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তারা প্রায়ই কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পোষণ করে, নিরাপত্তার নামে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে এবং নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রত্যাশা করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বর্ণবাদ এবং সংখ্যালঘু ও অভিবাসীদের প্রতি ভয়, যা ইউরোপের রাজনীতিবিদরা ভোটারদের, বিশেষ করে যারা বিশেষাধিকার হারানোর আশঙ্কায় আছে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহার করছে।

২০০০ সালের শুরু থেকে গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, ডানপন্থী প্রার্থীরা ক্রমশ শ্রমজীবী শ্রেণির সমর্থন পাচ্ছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা গেছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোডারের মতো মধ্য-বামপন্থি রাজনীতিবিদরা নতুন উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করেন। যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার উপর জোর দেয়। এই নীতিগুলো সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ালেও, শ্রমজীবী শ্রেণির বেতন বা সুযোগ-সুবিধা বাড়ায়নি বরং আয় বৈষম্য আরও বাড়িয়েছে। যদি বাম রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক নীতিগুলো শ্রমজীবী জনগণের জীবনমান উন্নত করত, তাহলে হয়তো তারা চরম ডানপন্থী দলগুলোর প্রতি এতটা এগিয়ে আসতো না। এর পরিবর্তে, মজুরি স্থবির থেকে গেছে এবং শ্রমিক সংগঠনের সদস্যপদ ও উৎপাদন শিল্পের চাকরির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

> ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে

রাজনীতি একটি ক্রমবিবর্তনশীল ক্ষেত্র, এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাবাদী হওয়া সহজ।কারণ অসহিষ্ণু রাজনীতিবিদরা শুধু ইউরোপেই নয়, আমেরিকাতেও ক্রমাগত অগ্রগতি লাভ করছে। আশা করা যায় যে ডানপন্থি রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং ভোটাররা এমন দলকে সমর্থন করবেন যারা স্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সময়ই বলবে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো গণতান্ত্রিক মান বজায় রাখবে কিনা এবং সেই মানদণ্ডগুলো ভোটারদের দ্বারা সমর্থিত হবে কিনা। এদিকে, গবেষকদের প্রয়োজন হবে তাদের পরিমাণগত এবং গুণগত বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া, যাতে আমরা ভোটারদের আচরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভাষা ও প্রস্তাবনার পেছনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারি। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ টেরি গিভেন্স <terri.givens@ubc.ca>

অনুবাদঃ
হেলাল উদ্দীন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

> প্রান্তিকতা থেকে প্রচারে: চরম ডানপন্থীদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির প্লাটফর্ম

দামলা কেসকেকচি, স্কুওলা নরমাল সুপিরিওরে, ইতালি

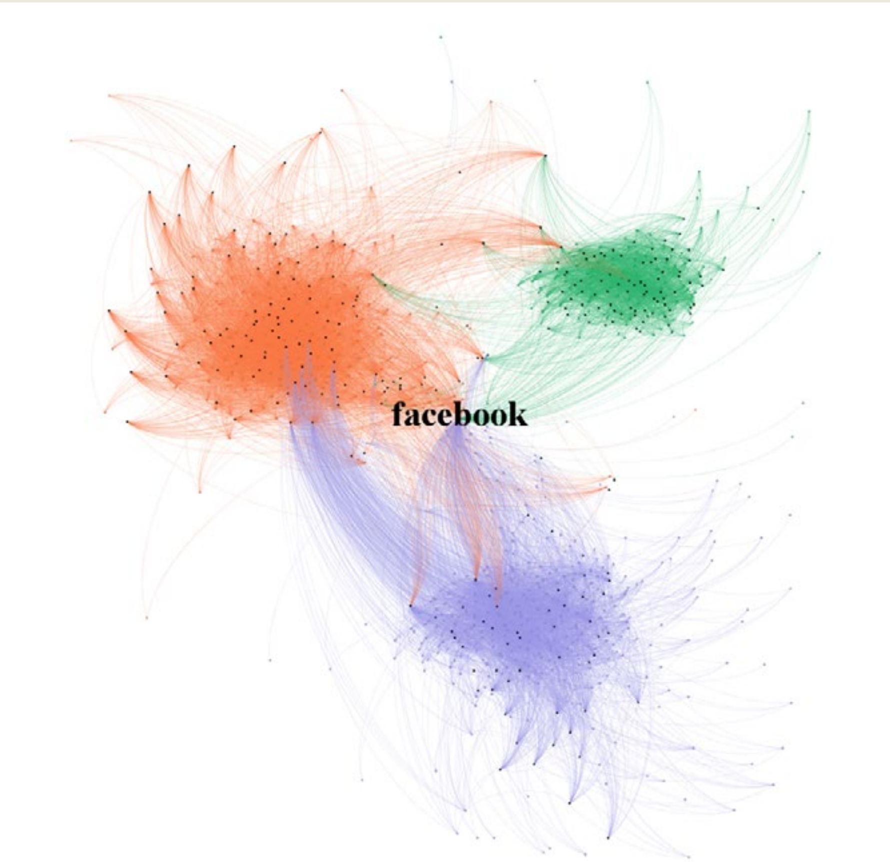

AT: Purple, DE: Orange, UK: Green, in-degree network of hyperlink shares by far-right actors (2017 – 2021)

অস্ট্রিয়া: বেগুনি; জার্মানি: কমলা; যুক্তরাজ্য: সবুজ। ফার-রাইট সংগঠনের ফেসবুক পেজে (২০১৭ ২০২১) শেয়ার করা হাইপারলিংকের ইন-ডিগ্রি নেটওয়ার্ক। ছবি তৈরি করেছেন লেখক।

একসময় প্রান্তিক অবস্থায় সীমাবদ্ধ দূর-ডানপন্থীরা ক্রমশ নিজেদের রাজনৈতিক মূলধারার স্বীকৃত ও স্বাভাবিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। লিরিয়াম স্পোনহোলজের সাথে যৌথ গবেষণা "পশ্চিম ইউরোপে মূলধারায় চরমপন্থার বিস্তার"-এ আমরা বিশ্লেষণ করেছি কীভাবে জার্মানির দূর-ডানপন্থীরা–রাজনৈতিক দল, বিকল্প মিডিয়া থেকে শুরু করে সামাজিক আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত গোষ্ঠীগুলো–ফেসবুকে কৌশলগতভাবে হাইপারলিঙ্ক ব্যবহার করে। ১০০টি পাবলিক ফেসবুক পেজের ১,২০,০০০+ পোস্টের (২০১৭-২০২০) এরও বেশি তথ্যসুত্রের ভিত্তিতে আমাদের বিশ্লেষণ এই প্রকাশ করেছে যে : কীভাবে প্ল্যাটফর্মের গতিশীলতা রাজনৈতিক যোগাযোগকে রূপ দেয় এবং "প্ল্যাটফর্মড মেইনস্ট্রিমিংচ (প্ল্যাটফর্ম-সহায়ক মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি) প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আমরা তিনটি মূল প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেছি, যা চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর জন্য এই মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে: ১. নিজেদের "স্বাভাবিক" হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং তা ধরে রাখা; ২. মূলধারার গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু শেয়ার করে বৈধতা অর্জনের চেষ্টা; ৩. প্ল্যাটফর্মের বিধিনিষেধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন। এই প্রক্রিয়ার ফলে একটি দ্বিমুখী গতি সৃষ্টি হয়–একদিকে দূর-ডান রাজনীতির স্বাভাবিকীকরণ, অন্যদিকে মূলধারার চরমপন্থাকরণ। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে প্রান্ত ও কেন্দ্র, অনলাইন ও অফলাইন, চরম ও মিতভাষী অবস্থানের মধ্যকার সীমারেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

> প্ল্যাটফর্মের যুক্তিবোধ ও হাইপারলিংকের কৌশলগত ব্যবহার

চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো শুধু অবসর বিনোদনের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে না; বরং তারা এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নিজস্ব যুক্তিবোধের সঙ্গে

>>

নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং কৌশলগতভাবে সেগুলোর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, ফেসবুকের প্ল্যাটফর্ম যুক্তি এমনভাবে তৈরি, যেখানে ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দৃশ্যমানতা বাড়ে। অর্থাৎ, যেসব বিষয়বস্তু মানুষের প্রতিক্রিয়া (যেমন: লাইক,লাভ ,হাহা ,ওয়াও ,স্যাড ,অ্যাংরি), মন্তব্য বা শেয়ার সৃষ্টি করে, সেগুলোরই অন্য ব্যবহারকারীর নিউজফিডে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এই প্রেক্ষিতে হাইপারলিংক এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, হাইপারলিংক ব্যবহার করা হয় মতাদর্শগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং চরম -ডান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের জন্য।

হাইপারলিংকের কৌশলগত ব্যবহার মূলধারায় প্ল্যাটফর্মনির্ভর অন্তর্ভুক্তির একটি কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করে। চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো মূলত এই হাইপারলিংক ব্যবহার করে–নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ, আত্মপ্রচার এবং বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিছু চরম -ডান বিকল্প মিডিয়া যেমন ব্লগ টিচিস আইনব্লিক এবং রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষককৃত মিডিয়া রাশিয়া টুডে ডিই (আরটি ডিই) নিজেদেরকে "সুপার-শেয়ারার" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে–তারা খুব অল্প সংখ্যক ওয়েবসাইট/ডোমেইন থেকে হাজার হাজার লিংক শেয়ার করে। অন্যদিকে, দূর-ডানপন্থী রাজনৈতিক দল যেমন এএফডি - অল্টারনেটিভ ফ্যুর ডয়েচল্যান্ড এবং সামাজিক আন্দোলন যেমন পেগিদা (প্যাট্রিয়টিক ইউরোপিয়ানস অ্যাগেইনস্ট দ্য ইসলামাইজেশন অফ দ্য ওয়েস্ট)। নিজেদের "সুপার-স্প্রেডার" হিসেবে কাজ করছে –তারা বিভিন্ন রকমের উৎস থেকে লিংক বিতরণ করে। এই লিঙ্ক-শেয়ারিং অনুশীলনগুলি কেবল ফেসবুকে চরম -ডানপন্থী পরিবেশের অভ্যন্তরীণ সংহতিকে শক্তিশালী করে না, বরং এর জনসাধারণের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনেও সহায়তা করে।

> ভাইরাল নয়, দৃশ্যমানতা: কৌশলের পরিবর্তন

চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-ভিত্তিক কৌশল কেবল "ভাইরাল" হওয়ার লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, তারা জোর দেয় নিয়মিতভাবে দৃশ্যমান থাকার ওপর। এ পর্যায়ে প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে–কারণ এই প্রক্রিয়া কেবল দূর-ডানদের উদ্দেশ্য দ্বারা নয়, বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা ও অনুমতির কাঠামো দ্বারাও পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ফেসবুকের মতো মূলধারার প্ল্যাটফর্মগুলো একটি বিচিত্র ও দ্বৈত ভূমিকা পালন করে–তারা একদিকে যেমন দ্বাররক্ষক, তেমনি অন্যদিকে সক্ষমতাদানকারী হিসেবেও কাজ করে। বিরোধপূর্ণভাবে, চরমপন্থী বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ ও সংযত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নিয়ম-কানুন শেষ পর্যন্ত দূর-ডান রাজনীতির স্বাভাবিকীকরণে অবদান রাখে।

উদাহরণস্বরূপ, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারির পর ২০১৮ সালে এক তরঙ্গের মতো ডি-প্ল্যাটফর্মাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীকে ফেসবুক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবুও, ফেসবুক এখনো বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে বিদ্যমান, এবং চরম -ডানপন্থীরা এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। আমাদের গবেষণায়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বিশ্লেষণকালীন সময়কালে অতি-ডানপন্থীদের সংখ্যা বেশিরভাগই স্থিতিশীল ছিল, যা ফেসবুককে জার্মান অতি-ডানপন্থীদের মধ্যে/জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রেখেছে।

> সূক্ষ্ম কাঠামোবিন্যাস ও আত্ম-সংযোগ দূর-ডানপন্থী গোষ্ঠীর দৃশ্যমানতা বজায় রাখে

২০১৮ সালের পর হাইপারলিংকের ব্যবহার কিছুটা কমে গেলেও, ফেসবুকে অবশিষ্ট চরম-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এটি একটি নিয়মিত ও সচেতন কৌশল হিসেবে বজায় ছিল। আমাদের অসংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মোট হাইপারলিংক শেয়ারের ৬৯%-ই ছিল দূর-ডানপন্থী মিডিয়া ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলোর শেয়ার করা। এই প্ল্যাটফর্মে দূর-ডান গোষ্ঠীর টিকে থাকা নিছক কাকতালীয় নয়; বরং এটি এমন একটি সচেতন কৌশলের ফল, যার মাধ্যমে তারা মূলধারার প্ল্যাটফ

ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মের যুক্তিবোধ এবং কমিউনিটি গাইডলাইন-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে, চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই প্রকাশ্য ঘৃণাভাষণ থেকে বিরত থাকে কিংবা বিতর্কিত চরমপন্থী উৎসের লিংক শেয়ার করে না। এভাবে তারা এক ধরনের অভিনয়মূলক সংযম এর চর্চা করে। অর্থাৎ, তারা নিজের বক্তব্যকে কিছুটা নরম করে উপস্থাপন করে, স্পষ্ট কর্ম-আহ্বান না জানিয়ে সূক্ষ্ম ভাষাগত কাঠামোর ওপর জোর দেয়, এবং এমন বহিরাগত ওয়েবসাইটের লিংক দেয় যেগুলো নজরদারি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

এরকম কৌশলের একটি পূর্বোক্ত উদাহরণ হলো চরম -ডান বিকল্প সংবাদমাধ্যম আরটি ডিই এবং ব্লগ টিচিস আইনব্লিক, যারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিজেদের তৃতীয় পক্ষীয় কনটেন্টে আত্ম-সংযোগ করার মাধ্যমেই ফেসবুকে সক্রিয় থাকে। এই কৌশল তাদেরকে সরাসরি কনটেন্ট মডারেশনের নজরদারি এড়িয়ে যেতে, দৃশ্যমানতা বজায় রাখতে, এবং বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে আরও পরিমিত ও মাঝারি ভাবমূর্তি উপস্থাপন করতে সহায়তা করে। অথচ, এর আড়ালে তারা এখনো বহিষ্কারমূলক ও অসহিষ্ণু রাজনৈতিক এজেন্ডা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে–যা তারা সমর্থন করে।

> "ঋণীত" বৈধতা এবং মূলধারার গণমাধ্যমের ভূমিকা

প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো মূলধারার গণমাধ্যম থেকে "ঋণীত" বৈধতার ব্যবহার। আমাদের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণ ছিল এই যে, চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো তাদের ফেসবুক পেজে বিকল্প সংবাদমাধ্যম নয় বরং মূলধারার সংবাদমাধ্যমের লিংক উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি শেয়ার করে। এছাড়াও কোন ধরনের গোষ্ঠী কোন ধরনের সংবাদমাধ্যমের লিংক শেয়ার করে, তা অভিনেতার ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যেমন–যেখানে এএফডি সাধারণত ডি ভেল্ট -এর মতো জাতীয় পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকার লিংক শেয়ার করে, অন্যদিকে পেগিডা তুলনামূলকভাবে বিল্ড কিংবা নর্ডবায়ার্ন -এর মতো ট্যাবলয়েড ও আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমের কনটেন্ট শেয়ার করতে বেশি আগ্রহী।

প্রচলিত গণমাধ্যম থেকে বৈধতা "ঋণ নেওয়ার"এই কৌশল চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে তাদের বার্তাবলীকে বিশ্বস্ত উৎসের ভিত্তিতে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেয়।এই ধরনের কৌশলের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে, মূলধারা ও প্রান্তিকতার মধ্যকার সীমারেখা হয়তো অনেকের ধারণার তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁলন্ত ও ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। দূর-ডান গোষ্ঠীগুলোর আর নিজেদের সব বিষয়বস্তু নিজস্বভাবে তৈরি করার প্রয়োজন নেই। বরং, তারা মূলধারার সংবাদমাধ্যম থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে তা নিজেদের পক্ষে উপযোগী করে উপস্থাপন করে–বিশেষত অভিবাসনবিরোধী, অভিজাতবিরোধী বা ইসলামবিদ্বেষমূলক অবস্থানকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

> গণতন্ত্রের উপর প্রভাব

ফেসবুকে জার্মান চরম -ডান গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে, তা থেকে বোঝা যায় যে "প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি" বিশ্বব্যাপী চরম -ডান অনলাইন যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করে। আমরা আজ যা প্রত্যক্ষ করছি, তা শুধু "মূলধারার চরমপন্থায় রূপান্তর"নয়, কিংবা "চরমপন্থার মূলধারায় ঢুকে পড়া"-ও নয়। বরং এটি

>>

একটি পারস্পরিকভাবে শক্তিশালী হওয়া প্রক্রিয়া। মূলধারার প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় থাকতে গিয়ে চরম-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো প্ল্যাটফর্মের নিয়মের সঙ্গে নিজেদের কৌশলগত খাপ খাইয়ে নেয়, অন্যদিকে প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব যুক্তিবোধ চরমপন্থী কনটেন্টকে এমনভাবে পুনরায় উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়, যাতে তা পরিমিত বা মধ্যপন্থী রূপে প্রকাশ পায়।

এই গতিশীলতা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। এটি তথ্য যাচাই হিসাবে, বিষয়বস্তু সংযম এবং প্ল্যাটফর্মমুক্তকরণের মতো পাল্টা কৌশলের কার্যকারিতাকে চ্যালেঞ্জ করে। প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির কৌশলগুলো কাজে লাগিয়ে, চরম-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নির্ধারিত সীমার মধ্যেই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে– যেমন: মূলধারার সংবাদমাধ্যমের কনটেন্ট ধার করে ব্যবহার, "নিরাপদ' ও মৃদু ধরনের বার্তা প্রয়োগ, অথবা দর্শকদের তৃতীয় পক্ষীয় ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে দেওয়া। ফলে, এখন আর প্রশ্নটি শুধু এ নয় যে, চরম -ডান গোষ্ঠীকে মূলধারার প্ল্যাটফর্মে থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না। কারণ, এই প্ল্যাটফর্মগুলো ইতিমধ্যেই চরম -ডান অনলাইন কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরি-ণত হয়ে গেছে।

আরও জরুরি প্রশ্ন হলো: যদি প্ল্যাটফর্মের নীতিমালা পরিবর্তিত হয়, তাহলে কী হবে? আসলে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মেটা ফেসবুক থেকে তৃতীয় পক্ষের তথ্য যাচাই ব্যবস্থা বাতিল করে, তার পরিবর্তে ব্যবহারকারীদের তৈরি "সম্প্রদায়-নির্ভর নোট" চালু করে। এছাড়াও, অভিবাসন এবং লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়সহ কোন ধরনের বিষয়বস্তু অনুমোদনযোগ্য তা নিয়ে নীতিমালা -এ পরিবর্তন আনা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শুধুমাত্র গুরুতর ও বেআইনি বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের দিকেই প্ল্যাটফর্মের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হবে। এই ধরনের নীতিগত পরিবর্তন "প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি" প্রক্রিয়ার জন্য কী অর্থ বহন করতে পারে? – এটি এক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

আমাদের গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, এই নতুন পরিবর্তনসমূহ অনলাইনে চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, মূলধারার চরমপন্থায় রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে পারে, এবং উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়বস্তুর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, ফেসবুক চরম -ডান গোষ্ঠীর প্ল্যাটফর্মনির্ভর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানের নতুন প্ল্যাটফর্ম-যুক্তিবোধ, যা তুলনামূলকভাবে দূর-ডান গোষ্ঠীগুলোর জন্য বেশি সহানুভূতিশীল বা গ্রহণযোগ্য, তা তাদেরকে নিজেদের মতবাদ আরও সহজে প্রচার করার সুযোগ করে দিতে পারে। এর ফলে, তারা মূলধারার রাজনৈতিক কথাবার্তায় নিজেদের উপস্থিতিকে আরও বেশি স্বাভাবিক করে তুলতে পারে।

ফলে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চরম -ডানপন্থী গোষ্ঠীকে মোকাবিলা করার কৌশলগত শুধুমাত্র তথ্য যাচাই, বিষয়বস্তুর নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণ বা একাডেমিক গবেষণার উপর নির্ভর করে সীমিত রাখা যাবে না। কারণ, দূর-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো শেষ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তিত যুক্তিবোধের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়, যাতে তারা তাদের মতবাদ প্রচার অব্যাহত রাখতে পারে। এই বাস্তবতায়, যেকোনো দৃশ্যমানতাভিত্তিক অবকাঠামোই চরমপন্থী কনটেন্টকে মূলধারায় নিয়ে আসার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্যার কার্যকর সমাধান পেতে হলে প্রয়োজন একটি কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিবেশ নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন, মুনাফাভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যাদের নিজেদেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।■

সরাসরি যোগাযোগ: দামলা কেসকেকচি <damla.keskekci@sns.it>

অনুবাদ:
মোঃ নাসিম উদ্দীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

>পুরুষত্বের উন্নয়ন:

পুরুষদের আত্মউন্নয়ন নেটওয়ার্ক এবং আদর্শগত সংঘর্ষের ক্ষেত্র

পাশা দাশতগার্ড, পোলারাইজেশন অ্যান্ড এক্সট্রিমিজম রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাব, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছেলে ও পুরুষেরা সাধারণভাবে নিজেদের সত্তা আর সমাজের প্রত্যাশার ফারাকেই অস্থিরতা অনুভব করে। ক্রেডিট: এলিয়াস শ্যাফারলে, পিক্সাবে।

> ভূমিকা

পুরুষ আধিপত্যবাদী মতাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত এমন অন-লাইন সংস্থানগুলো ছেলে ও পুরুষদের জন্য ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে। মূলত সমর্থন, দিকনির্দেশনা এবং বন্ধুত্বের জন্য ফোরাম হিসাবে আবির্ভূত হওয়া, এই পুরুষ-কেন্দ্রিক স্থানগুলোর মধ্যে অনেকগুলো এখন উগ্রপন্থার প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ডেটিং এবং সম্পর্কের ফোরাম, ফিটনেস এবং ফ্যাশন সম্প্রদায়, বা গেমিং এবং ক্রীড়া আলোচনা বোর্ড যাই হোক না কেন, ঘৃণ্য যৌনতাবাদী বক্তব্য ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সনাক্ত করা কঠিন যখন সেগুলো সূক্ষ্মভাবে এমন তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা অরাজনৈতিক বা স্ব-উন্নতি ভিত্তিক বলে মনে হয়, যা তাদের প্রসারিত করতে সহায়তা করে।

এই বিভিন্ন পুরুষ-কেন্দ্রিক অনলাইন স্থানগুলোর একটি মাধ্যম হিসেবে যা খুঁজে পাওয়া যায় তা হল আত্ম- অনুকূলকরণের উপর তীব্র মনোযোগ। এই প্রসঙ্গে আত্ম- অনুকূলকরণকে আত্ম-উন্নতির জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন, স্বাধীন পদ্ধতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা প্রায়শই ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং সমাজের প্রত্যাশা উভয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আত্ম- অনুকূলকরণের উপর স্থিরকরণের ফলস্বরূপ স্ব-ট্র্যাকিং অনুশীলন, ফিটনেস প্রশিক্ষণ, কসমেটিক সার্জারি, নিউরো বর্ধন, খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক ব্যবহার এবং ডেটিং এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি কঠোর, সূত্রগত কৌশল এবং পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজের শরীর এবং জীবনধারাকে 'সর্বাধিক' করার প্রতি আচ্ছন্নতা তৈরি হতে পারে, যদিও আত্ম-উন্নতি নিজেই পুরোপুরি স্বাস্থ্যকর। আত্ম- অনুকূলকরণের আখ্যানটি একাধিক বহু-মিলিয়ন ডলারের শিল্পে অবদান রাখে যা অভ্যন্তরীণ লজ্জা, আত্ম-বিদ্বেষ এবং পুরুষত্বের একটি আদর্শ রূপ অর্জনের জন্য মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই ধারণাগুলোকে অভ্যন্তরীণ করার ফলে অনুকূলকরণে ব্যর্থ বা যারা আত্ম- অনুকূলকরণ করেনা তাদেরকে বিশেষ করে নিজের জন্য কম হিসাবে দেখা হয়। এটি ছেলে এবং পুরুষদের উপর শারীরিক সুস্থতা, যৌন দক্ষতা এবং আর্থিক সাফল্যের এক অসম্ভব সমন্বয় অর্জনের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, যার বাইরে আর কিছুই সঠিকভাবে পুরুষত্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে সর্বাধিক করার আকাঙ্ক্ষা একজনকে আদর্শিক প্ররোচনার প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে। বিশেষত,

>>

হেনস্লার (২০০৪) উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে নৈতিক শুদ্ধতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত উদ্বেগগুলো উপ-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং সমষ্টিগত পরিচয়ের বিকাশের জন্য একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিজেকে উন্নত করার ইচ্ছা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও ভালো একটি লক্ষ্য। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই উন্নতিকে 'বিশুদ্ধতা' বা 'কঠোর শৃঙ্খলা' এর সাথে যুক্ত করে বিশেষ করে যখন তা কষ্ট বা ভোগ থেকে আনন্দ বর্জনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় । এই পরিস্থিতিতে খারাপ মানুষ এবং বিষাক্ত মতাদর্শগুলোকে ঐতিহ্যবাহী পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের অভাবকে নৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়, যা নারীবাদ এবং প্রগতিশীল অবক্ষয় আধুনিক পুরুষদের কীভাবে কলুষিত করেছে তার একটি উদাহরণ।

> ডেটিং এবং সম্পর্ক: রেড পিল এবং 'ম্যানোস্ফিয়ার' এর উত্থান

ডেটিং এবং সম্পর্ক নিয়ে অনলাইনে আলোচনা, ডানপন্থী চরমপন্থা মতাদর্শের মূলে থাকা সবচেয়ে দৃশ্যমান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটি। 'রেড পিল' সম্প্রদায় ও 'ম্যানোস্ফিয়ার' নামক সম্প্রদায়গুলো - পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ববাদী মতাদর্শের জন্য নিবেদিত অনলাইন স্থানগুলোর একটি নেটওয়ার্ক। যা মূলত নারী বিদ্বেষী মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং এখানে ছেলেদের ও পুরুষদের এমন সব পরামর্শ দেওয়া হয় যেমন: কীভাবে নারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কিভাবে যত বেশি সম্ভব নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করতে হয়, এবং কীভাবে 'আলফা পুরুষ' হওয়া যায় যাকে নারীরা উপেক্ষা করতে পারে না। এই ফোরাম, ওয়েবসাইট, অ্যাপ এবং প্ল্যাটফর্মগুলো নারীবাদ এবং নারীর ক্ষমতায়নকে পুরুষদের জন্য সরাসরি হুমকি হিসাবে উপস্থাপন করে। এখানে পুরনো লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়, যেখানে নারীদেরকে দেখা হয় প্রতারক, স্বার্থপর এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। এই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী পুরুষদের উৎসাহিত করা হয় সম্পর্কে আধিপত্য বজায় রাখতে এবং সমতা বা প্রগতিশীল লিঙ্গ ধারণা থেকে দূরে থাকতে। যদিও এসব কথা প্রথমে ডেটিং পরামর্শের মতো শোনায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তা আরও চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে।

ম্যানোস্ফিয়ারের মধ্যে আরেকটি বিপজ্জনক উপগোষ্ঠী হল 'মিসোজিনিস্টিক ইনসেল' (অনিচ্ছাকৃত ব্রহ্মচারী) সম্প্রদায়, যার অর্থ হলো; 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিবাহিত' বা যৌন সম্পর্কবঞ্চিত পুরুষ। নারীবিদ্বেষী ইনসেলরা বিশ্বাস করে যে সমাজে নারীবাদী ও নারীকেন্দ্রিক একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে শুধু আকর্ষণীয় এবং প্রভাবশালী পুরুষদের নারীরা পছন্দ করে। ফলে তারা নিজেরা ভালোবাসা বা যৌন সম্পর্কে কোনো আশা দেখতে পায় না। অনেক ইনসেল তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রামের জন্য নারীবাদ, বহুসংস্কৃতিবাদ এবং অন্যান্য অনুভূত সামাজিক পরিবর্তনকে দায়ী করে। এ থেকে জন্ম নেয় গভীর হতাশা ও ঘৃণা, যা কখনো কখনো সহিংসতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। ইনসেল সমাজের প্রতি একটি নিয়তিবাদী, জৈবিকভাবে নির্ধারণমূলক মনোভাব গ্রহণ করে, যেখানে তারা মনে করে, মানুষের জিনগত গঠন বা বাহ্যিক চেহারাই একজনকে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়, অথবা দুর্দশা এবং ব্যর্থতার জীবনে পরিণত করে। এই চিন্তাধারা কেবল অনলাইন ঘৃণাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইনসেল সংশ্লিষ্ট সহিংসতা, যেমন গণহত্যা বা গুলি চালানোর মতো ঘটনাগুলো দেখায়, এই বিষাক্ত মতাদর্শের বাস্তব পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

> ফ্যাশন ও ফিটনেস: 'লুক্সম্যাক্সিং' থেকে চরমপন্থায় যাত্রা

অনলাইন অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেগুলো ছেলেদের এবং পুরুষদেরকে সুন্দর পোশাক পরতে, সিক্স প্যাক অ্যাবস পেতে এবং নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে সাজাতে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু এসব জায়গা ধীরে ধীরে এমন এক ধারণায় ভরে উঠছে, যা পুরুষদের অনিশ্চয়তা ও 'আধিপত্যশীল পুরুষ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষতিকর চিন্তাধারার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'লুক্সম্যাক্সিং' হলো এমন একটি অনলাইন প্রবণতা, যেখানে বলা হয় কীভাবে নিজের চেহারা ও আকর্ষণীয়তা বাড়ানো যায় এবং এতে অনেক সময় ভুয়া বিজ্ঞান, বিকল্প চিকিৎসা এবং পুরুষ আধিপত্যবাদী নানা কৌশল ব্যবহার করতে বলা হয়। মোটামুটি দেখলে এসব বিষয় আত্মউন্নতির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলোর অনেক কথাবার্তা আসলে পুরুষত্ব, জিনগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক শ্রেণিবিভাগ নিয়ে ভুল ও ক্ষতিকর ধারণা ছড়ায়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি আত্ম-উন্নতির একটি রূপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলোর অনেক কথাবার্তা আসলে পুরুষত্ব, জিনগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক শ্রেণিবিভাগ নিয়ে ভুল ও ক্ষতিকারক ধারণাগুলোকে আরও শক্তিশালী করে। অনেক সময় এই আলোচনা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বা ইউজেনিক্স-এর মতো চরমপন্থী বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়, যেখানে বলা হয় কেবল নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর (বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ, অ্যাংলো-স্যাক্সন) শারীরিক বৈশিষ্ট্যই আকর্ষণীয়, এবং জিনই সবার ভাগ্য নির্ধারণ করে।

ফিটনেস বা শরীরচর্চা এখন অনেক ক্ষেত্রেই ডানপন্থী চরমপন্থার বা মৌলবাদের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে। অনেক পুরুষ আধিপত্যবাদী প্রভাবশালী ব্যক্তি ও আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষে কথা বলার জন্য ফিটনেস এবং পুরুষদের শারীরিকভাবে উন্নত করার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করেন। তারা শক্তি, শৃঙ্খলা এবং আধিপত্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে যা কখনও কখনও ব্যক্তিগত নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এবং যা পরবর্তীতে একটি বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তৈরি করা হয়, যা আদর্শিক বিভাজনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। অনেক অনলাইন ফিটনেস প্ল্যাটফর্মে এমন ধারণা দেওয়া হয় যে, যদি কেউ চেহারায় চটকদার ও শক্তপোক্ত না হয়, তাহলে সেটা শুধু শারীরিক দুর্বলতা নয় বরং নৈতিক দুর্বলতা, আত্মসংযমের অভাব এবং ইচ্ছাশক্তির ব্যর্থতা।

ডানপন্থী চরমপন্থীরা এখন ফিটনেসকেও নিজেদের আদর্শ ছড়ানোর হাতিয়ার বানাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছে 'অ্যাকটিভ ক্লাব' নামে কিছু গোষ্ঠী, যেখানে মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের সঙ্গে চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ মিশিয়ে দেওয়া হয়।এই ক্লাবগুলো সাধারণভাবে আত্মরক্ষা, আত্মউন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কথা বলে পুরুষদেরর আকৃষ্ট করে। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় এগুলো রাজনৈতিক সহিংসতার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। ফিটনেস এবং অতি-ডানপন্থী চরমপন্থার মধ্যে এই সংযোগটি বোঝায় যে আপাতদৃষ্টিতে কীভাবে নিরীহ মনে হওয়া অনলাইন সম্প্রদায়গুলোও ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের উগ্রবাদে পরিণত হতে পারে।

> খেলাধুলা ও ভিডিও গেমিং: পুরুষ আধিপত্যকে স্বাভাবিক করার নতুন ক্ষেত্র

ঐতিহ্যগত আত্মউন্নয়নমূলক ক্ষেত্রের বাইরেও, পুরুষ আধিপত্যবাদী চিন্তাধারা এখন ভিডিও গেম ও খেলাধুলা সংক্রান্ত ফোরামগুলোতেও প্রবেশ করেছে, যা অনলাইনে ছেলেদের ও পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এর ফলস্বরূপ, আত্মউন্নয়ন বা নিজের দক্ষতা বাড়ানোর ধারণাগুলো এখন খেলাধুলা ও গেমিং নিয়ে আলোচনার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

গেমিং জৈবিকভাবে এমন বিশেষ কিছু অনলাইন সম্প্রদায় তৈরি করে যারা হয় ভিডিওগেম খেলেন অথবা উক্ত গেমটি তৈরিকারী কোম্পানিকে অনুসরণ করেন। এসব গেমিং কমিউনিটি সাধারণত নির্দিষ্ট গেম বা গেম-সংক্রান্ত আগ্রহকে ঘিরে গড়ে ওঠে। ২০১৪ সালের হ্যাশট্যাগ গেমার গেট ছিল একটি বিতর্কিত ঘটনা ও অনলাইন হয়রানিমূলক প্রচারণা, যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ভিডিও গেম সাংবাদিকতায় নৈতিকতা নিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে, এটি ছিল গেমিং সম্প্রদায়ের ভেতরে নারীবিদ্বেষী এবং প্রগতিবিরোধী

>>

মনোভাব দ্বারা পরিচালিত একটি আন্দোলন। এই ঘটনার মধ্যে ছিল একত্রিত হয়ে নারীদের টার্গেট করে হয়রানি, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া। এর মূল লক্ষ্য ছিল নারী গেম ডেভেলপার, সমালোচক ও সাংবাদিক, যারা গেমিং জগতে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির পক্ষে কথা বলছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, ভিডিও গেমের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা জোরালো দলীয় মনোভাব তৈরি হতে পারে, এবং এই ধরনের সম্প্রদায়গুলো অনেক সময় চরমপন্থায় চলে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকতে পারে।

অনেক গেমিং ফোরামে আজও 'রাজনৈতিকভাবে ভুল' সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যেখানে বর্ণবাদী, যৌনতাবাদী, নারীবিদ্বেষী ও সমকামিতা-বিরোধী রসিকতা প্রায়ই স্বাভাবিক ভেবে করা হয়। এগুলো বাকস্বাধীনতার আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিদ্বেষমূলক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে। যদিও হ্যাশট্যাগ গেমার গেট আর অনলাইনে একটি উৎসাহব্যঞ্জক শক্তি হিসেবে কাজ করে না, তবুও হ্যাশট্যাগ গেমার গেট-এর উত্তরাধিকার অনুভূত হতে পারে গেম, সিনেমা এবং টেলিভিশন শোতে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। যেখানে বিভিন্ন কাস্টিং বা কেন্দ্রীভূত গল্প এবং চরিত্রগুলোকে 'জাগ্রত' বা প্রগতিশীল বলে মনে করা হয়।

ক্রীড়া প্রভাবশালীরা (ইনফ্লুয়েন্সাররা) ইউটিউব ও পডকাস্টের মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেইসব ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য ছড়ান, যারা সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। তারা খেলাধুলার কভারেজের সঙ্গে প্রায়ই সংরক্ষণশীল রাজনৈতিক মতামত মিশিয়ে দেন এবং খেলাধুলায় প্রগতিশীল আন্দোলন, যেমন বর্ণবৈষম্য বিরোধী প্রতিবাদ বা লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন। এর একটি উদাহরণ হল বারস্টুল স্পোর্টস, একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস মিডিয়া ব্র্যান্ড, যা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী চিন্তাধারাকে মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এটি নিজেকে একটি মজাদার, হালকা ধাঁচের ভাই-সংস্কৃতি (ব্রো কালচার) মিডিয়া আউটলেট হিসাবে উপস্থাপন করে। এর বিষয়বস্তু প্রায়শই নারী বিদ্বেষকে উৎসাহিত করে, প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোকে তাচ্ছিল্য করে এবং অতিরিক্ত পুরুষত্ব বা 'হাইপার-ম্যাসকুলিনিটি'র সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। বারস্টুল স্পোর্টস এর নিয়মিত কিছু কনটেন্ট সিরিজ চালায় যেগুলোর নাম হলোঃ গেস দ্যাট আস, গেস দ্যাট র‍্যাক এবং টার্ক উইডনসডে। এছাড়াও ২০১০ সালে, বারস্টুল স্পোর্টসের নির্মাতা ডেভ পোর্টনয় লিখেছিলেন, "আমি কখনই ধর্ষণকে সমর্থন করি না, কিন্তু যদি আপনি ৬ সাইজের হন এবং স্কিনি জিন্স পরেন তবে আপনি ধর্ষিত হওয়ার যোগ্য, তাই না।" এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে হাস্যকর, তীক্ষ্ণ এবং বিদ্রোহী হিসেবে উপস্থাপন করে, এটি তরুণদের কাছে এগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে যারা হয়তো কেবল ক্রীড়া কভারেজের সাথে জড়িত থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি যে তারা পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ববাদী মতাদর্শের সাথেও জড়িত। এই মতবাদগুলোকে হাস্যরসপূর্ণ, চটুল ও বিদ্রোহী হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এগুলো তরুণ পুরুষদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, যারা হয়তো শুধুমাত্র খেলাধুলার খবর নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে আসলে তারা পুরুষ আধিপত্যবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

> উপসংহার

পুরুষ ও ছেলেদের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে পুরুষ আধিপত্যবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হচ্ছে, যা একসময় সহায়ক হওয়া সম্প্রদায়গুলোকে চরমপন্থার কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করছে। ডেটিং পরামর্শ, ফিটনেস, ফ্যাশন, খেলাধুলা বা গেমিংয়ের মাধ্যমে আত্মউন্নতির ছদ্মবেশে এসব জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা প্রচার পাচ্ছে, যা পুরানো লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস এবং বর্জনমূলক মানসিকতাকে স্বাভাবিক করে তোলে। এই স্থানগুলোতে অতি-ডানপন্থী মতাদর্শের অনুপ্রবেশ হচ্ছে, যা দেখায় পুরুষ ও ছেলেদের জন্য আরও স্বাস্থ্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রদায় তৈরির প্রয়োজন কতটা জরুরি।

এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, আমাদের প্রশ্ন করতে হবেঃ ছেলে ও পুরুষেরা কোথায় এমন একটি সম্প্রদায় গড়তে পারবে, যেখানে পুরুষ আধিপত্যবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে তৈরি বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে বাধ্য না হয়ে নিজের মতো থাকতে পারে? এর উত্তর নিহিত রয়েছে নতুন, ইতিবাচক স্থান তৈরি করার মধ্যে যা সুস্থ পুরুষত্ব, মানসিক বুদ্ধিমত্তা এবং প্রকৃত সমর্থনকে উৎসাহিত করে। পরিচয়, দুর্বলতা এবং সম্মান সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনাকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে তরুণদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। সর্বোপরি, সমাজকে এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলায় বিনিয়োগ করতে হবে যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ আদর্শিক চক্র থেকে দূরে থেকেও পুরুষ ও ছেলেরা নিরাপদে যোগাযোগ করতে এবং নিজেকে উন্নত করতে পারে। ছেলে এবং পুরুষরা এমন সম্প্রদায় এবং অনলাইন স্থান খোঁজে যা পরামর্শ, নির্দেশনা এবং সম্প্রদায় প্রদান করে; ছেলে এবং পুরুষদের স্বার্থের জন্য নিবেদিত অনলাইন স্থানগুলো কেন নারীবিদ্বেষ এবং চরমপন্থার জন্য নিবেদিত হয়ে উঠবে, তার কোনো কারণ নেই। ■

সরাসরি যোগাযোগ করুনঃ পাশা দাশতগার্ড <dashtgard@american.edu>

অনুবাদঃ
রুমা পারভীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> উগ্র ডানপন্থীদের দ্বারা ফ্যাশনের অস্ত্রীকরণ

আন্দ্রিয়া গ্রিপ্লো, দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

সমরূপতা থেকে খণ্ডিততায়নঃ ডানপন্থী রাজনীতির নান্দনিক ভেসে চলা। ছবি তৈরি করেছেন লেখক, চ্যাটজিপিটি দিয়ে।

চরম ডানপন্থীদের সম্মিলিত কার্যকলাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। সরাসরি রাজনৈতিক বিরোধের পাশাপাশি প্রতীকী, নান্দনিক এবং প্রদর্শনমূলক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো এখন জীবনযাপনের ধরণের মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত কল্পনাকে নতুনভাবে গঠন করতে, সাংস্কৃতিক পরিচয় কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনকে প্রভাবিত করতে চায়।

> উগ্র ডানপন্থি গোষ্ঠীতে ফ্যাশনের ভূমিকার পরিবর্তনশীল ভূমিকা

সাংস্কৃতিক আধিপত্যের যুদ্ধে ফ্যাশন উগ্র ডানপন্থীদের একটি খুবই সক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে আবর্তিত হচ্ছে। এটি একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে বঞ্চনামূলক কথন, জাতীয়তাবাদী সম্পর্কিত বিভ্রান্তি এবং একনায়কতান্ত্রিক আদর্শকে ছড়ানো এবং স্বাভাবিকীকরণ করা যায়। এভাবেই উগ্র ডানপন্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ফ্যাশনকে কৌশলগতভাবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাৎসি ত্বক উপসংস্কৃতিতে, ফ্যাশন উক্ত গোষ্ঠীতে প্রবেশের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এবং পরিচয় তৈরির প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। সংকুলন পদ্ধতির মাধ্যমে নাৎসি ত্বক গোষ্ঠী ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর ধরনের সঙ্গে জ্যামাইকান এবং মড সংস্কৃতির প্রভাব মিলিয়ে, নিজেদের একটি নান্দনিক রূপ তৈরি করে যার বৈশিষ্ট্য ছিল মুন্ডনকৃত মাথা, চামড়ার জ্যাকেট আর যুদ্ধ বুট। যদিও এটি ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী ছিলো, বর্তমানে এই মাথার ত্বকের নান্দনিকতা স্টাইলটি উগ্র ডানপন্থীদের বিকৃত ও অতিবিভাজিত চেহারাভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ধারামাত্র।

১৯৯০ এর শেষার্ধ থেকেই, উগ্র ডানপন্থী ফ্যাশনে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। যেখানে তারা পূর্বের ব্যবহৃত স্পষ্টবাদিতাকে ছদ্মবেশিতা ও অস্পষ্টতার আড়ালে ঢেকে ফেলেছে। এই গোষ্ঠিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নান্দনিক একই রকম সৌন্দর্য হওয়ার এখন আর কোন আবশ্যকতা নেই; বরং বর্তমানে ফ্যাশন হচ্ছে ভিন্নতা তৈরি এবং নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার একটি মাধ্যম। মিলার ইদ্রিসের মতে, বর্তমানে সময়ের উগ্র ডানপন্থী তরুণরা তাদের নিজেদের নিজস্বতা প্রকাশ করেও ডানপন্থী হতে পারে।

উগ্র ডানপন্থীরা "ল্যাঙ্গুয়েজ অব ফ্যাশন" কে আলিঙ্গন করেছে যা শুধুমাত্র পরিচয় ও অন্তর্ভুক্তির নয়, বরং প্রতীক, স্টাইল এবং নিত্য ভোগ্যপণ্যের মাধ্যমে দৃশ্যমানতা অর্জন, নতুন অনুগামীদের আকর্ষণ এবং এর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাভাবিকীকরণ করা। তারা নান্দনিক কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করেছে দৃশ্যমান ভাষা, স্টাইল এবং প্রতীকীবাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনী ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে। এই নান্দনিক পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সীমানাকে বৃদ্ধির মাধ্যমে সহজেই মূলধারার পরিবেশে ঢোকার সুযোগ করে দেয়।

> জেনারেশন এক্স (১৯৬৫-১৯৮০): নান্দনিক বিদ্রোহ এবং শৈলীর সংমিশ্রণ

নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে, উগ্র ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে গেছে, যেখানে তারা নব্য নাৎসি ত্বক উপ-সংস্কৃতির অনমনীয় অভিন্নতা থেকে সরে এসেছে এবং আরও বেশি বিচিত্র, মিশ্র এবং প্রতিবাদী সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করেছে। এই সময়ে যে দৃষ্টিগ্রাহী প্রতীকী চরিত্র আবির্ভূত হয়েছিল তা হলো ভাইকিং যোদ্ধাঃ পোশাকের উপর ব্রোঞ্জ (লিপি), ভালহাল্লার (স্বর্গ) উল্লেখ এবং থরের মতো পৌরাণিক চরিত্র যা যৌথভাবে শক্তির প্রতীক এবং জাতিগত পরিচয় প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এগুলো সচরাচর দেখা যেত। এই পৌরাণিক রেফারেন্সগুলো ক্রমশও উগ্র

>>

ডানপন্থীদের ঐতিহ্যগত প্রতীক, বাইকার, রকার এবং হুলিগান(দাঙ্গাবাজ) সংস্কৃতির উপাদানের সাথে মিশে যায়। স্ট্রিটওয়ার (রাস্তার পোশাক) যা পু-রুষসুলভ বিদ্রোহের সাথে আদর্শিক মতের ভারসাম্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যমান পরিচিতি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব প্রতীকসমূহ সাংকেতিক ও অস্পষ্ট হওয়ার দরুন পরিধানকারীরা জনসাধারণের নজরে এড়িয়েও রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করতে পারে।

থর স্টেইনার আসার পর তাতে নতুন মোড় নেয়। এটি একটি জার্মান ব্রান্ড যা নর্ডিক ও জার্মানির পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে গঠিত কৌশলগত বাহ্যিক ফ্যাশন। এর লোগো, সংখ্যাগুলি (যেমন "৪৪") এবং রানিক প্রতীকগুলো মূলত উগ্র ডানপন্থীদের মধ্যে ব্যবহৃত এমন ধরনের সংকেত যা জনসম্মুখে অস্বীকার করা যেত। এমনকি এই ব্রান্ডের নামটি "থরচ নর্স পুরাণের বজ্রের দেবতা, এর সাথে "স্টেইনারচ শব্দটিও ওয়াফেন -এসএসএস জেনারেল ফেলিক্স স্টেইনার এর সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল। এই কর্মকৌশলটি স্পষ্ট: মূলধারার জনপ্রিয় নকশার সাথে চরমপন্থী প্রতীকীবাদকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এই কর্মকৌশলটি একটি মানদন্ড দাড় করিয়েছে। এরিক এন্ড সন্স, আন্সগ-ার আরিয়ানের মতো ব্রান্ডগুলো এই যোদ্ধার আদর্শ চিন্তাধারা যা ঐতিহ্য, শক্তিমত্তা এবং প্রতিরোধ গড়ায় গুরুত্ব দেয় সেগুলোকে অনুসরণ করে এবং জোর দেয়। যদিও এটি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের বার্তাবাহক কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা নিরপেক্ষ।

> মিলেনিয়ালস (১৯৮১-১৯৯৬): প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ ও সাংস্কৃতিক ছদ্মবেশ

ডিজিটাল সংস্কৃতির উত্থান, উগ্র ডানপন্থী ফ্যাশনে আবারো পরিবর্তন আনে। আক্রমাত্মক ও যুদ্ধাংদেহী স্টাইল সরে গিয়েছে এবং জায়গা করে দিয়েছে প্রাত্যহিক পরার উপযোগী খেলাধুলার পোশাক, সাধারণ, হিপস্টার স্টাইলের মত আরো পরিশীলিত ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যকে। এছাড়াও যুদ্ধ জুতা ও বোম্বার জ্যাকেটের পরিবর্তে এসেছে সাদামাটা হালকা নরম রঙ্গের পোলো শার্ট।

প্রতীকাত্মকভাবে, ভাইকিং যুগের শৈলী ম্লান হয়েছে। তার স্থানে ব্রান্ডগুলো প্রাচীন ঐতিহাসিকতা: স্পার্টা, রোম, ফ্যালাঙ্ক্স, লেজিয়নকে গ্রহণ করেছে। উগ্র ডানপন্থীরা বহুসংস্কৃতিবাদের আগ্রাসনে নিমজ্জিত একত্রিত গ্রিক ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের নতুনভাবে ভাবছে। এখানে দৃশ্যমান সংস্কৃতি ইউরোপকে একটি সভ্য, স্বতন্ত্র ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে শুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই পরিবর্তন জাতিগত বহুত্ববাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের উর্ধ্বে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দেয়। ফ্যালাঙ্ক্স ইউরোপা, পিভার্ট, এবং পেরিপেটিকের মত ব্রান্ডগুলো পোশাকে গ্রিক ও ল্যাটিন স্লোগান, সাধারণ সাদামাটা পোশাকে বীরত্বপূর্ণ প্রতীকের ব্যবহারকে ম্লান করে দেয়।

সহনশীলতা এবং সংস্কৃতির উৎপত্তিগত থিমগুলো স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নান্দনিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কৌশলটি ব্রান্ডগুলোকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা একই সঙ্গে জাতিগত গোষ্ঠী ও মূলধারা সমাজের ভেতরে চলতে পারে। এভাবে পোশাক বর্তমানে ট্রোজান হর্স এর মত পরিলক্ষিত হচ্ছে যেটা বাহ্যিক দিকে নিরপেক্ষ কিন্তু অভ্যন্তরীন দিক থেকে আদর্শিক বার্তা বহন করে।

> জেনারেশন জি (১৯৯৭-২০১২): নান্দনিক অতি সাধারণীকরণ এবং দৃশ্যমান কর্মক্ষমতা

জেন জির সাথে উগ্র ডানপন্থী ফ্যাশন ছন্দের মধ্য দিয়ে বিদ্রুপতা, নমনীয়তা এবং অস্পষ্টতাকে গ্রহণ করেছে। অনলাইন প্লাটফর্মের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা এ জেনারেশন মিম সংস্কৃতি, পপ সংস্কৃতি, সৃজনশীল বিদ্রোহ করার সংস্কৃতিকে একীভূত করে ফেলেছে। আদর্শিক বার্তা গুলো হালকা বা রসাত্মক ডিজাইনের সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয় যেখানে প্রায় বিভিন্ন সংঘাত সৃষ্টিকারী প্রতীক যেমন এলজিবিটিকিউ বা বামপন্থী স্লোগানও থাকে, এবং সেগুলোকে আদর্শগত বিপর্যয় বা উপহাসের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একটি সেরা উদাহরণ হতে পারে টিম কেলনার, জার্মান উগ্র ডানপন্থী ইউটিউবার যিনি তার রংধনুর রঙের ফ্যাশন, ইউনিকর্ন এবং উপহাসমূলক স্লোগান এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে বিদ্রুপ করেন। তার বিক্রিত পণ্যগুলো উজ্জ্বল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিদ্বেষপূর্ণ বিষয়বস্তুকে একত্র করে। এই গণন-ালব্ধ দৃশ্যমান অসামঞ্জস্যতা যেখানে চরমপন্থী বিষয়বস্তুকে জনপ্রিয় পপ সংস্কৃতির মোড়কে উপস্থাপন করা হয়- সেটা বর্তমানে জেনারেশন জি এর উগ্র ডানপন্থী ফ্যাশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে।

> উপসংহার

উগ্র ডানপন্থী ফ্যাশন একরূপতা থেকে সংকরায়ন, পুরাণবিদ্যা থেকে ধ্রুপদী সভ্যতা, এবং অবশেষে গুপ্ত সাংকেতিক প্রতীক থেকে অতি সাধারনীকৃত বিদ্রুপতার মাধ্যমে একটি অত্যাধুনিক রুচিশীল ব্যবস্থাকে বিকশিত করেছে। যেটা শুরু হয়েছিল উপসংস্কৃতিক পরিচয় থেকে, তা এখন পরিপূর্ণভাবে একটি সক্রিয় ও কর্মক্ষম জীবনধারার বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা চরমপন্থী কর্মকাণ্ডগুলোকে দৈনন্দিন পোশাক-আশাকের মাধ্যমে স্বাভাবিকী-করণ করতে সক্ষম।

এই উগ্র ডানপন্থী নান্দনিককে মূলধারার ফ্যাশন এর সাথে একীভূত করার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র একটি ব্র্যান্ডিং তৈরি করা নয় বরং এটি স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক কর্মকৌশল। এইভাবে উগ্র ডানপন্থীরা দৈনন্দিন ভোগবাদী সংস্কৃতির সাথে তাদের আদর্শকে একত্র করার মাধ্যমে তারা তাদের গ্রহণযোগ্য আলোচনার সীমাকে পরিবর্তন করেছে। তাদের ব্যবহৃত সাধারনীকৃত এবং পরিপাটি স্টাইল তাদেরকে ঝুঁকিমুক্ত হিসেবে আবির্ভূত করেছে। এছাড়াও তাদের অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক পরিবেশের অংশ হিসেবে তুলে ধরে। এর ফলাফল হলো, একটি সূক্ষ্ম, নান্দনিক কপটতাপূর্ণ দৃশ্যমান যুদ্ধ - যেখানে চরমপন্থাকে নমনীয়, উপহাসপূর্ণ করে মূলধারা নিয়ে উপস্থাপন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এ ধরনের ব্যবস্থা সমাজে ঢুকে পড়াটা আরো কার্যকর হয়। এভাবেই ফ্যাশনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর চরমপন্থকে স্বাভাবিকীকরণ করা হয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : আন্দ্রিয়া গ্রিপ্পো <a.grippo@akbild.ac.at>

অনুবাদ :
সাদিয়া বিনতে জামান, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> উগ্র ডানপন্থা কিভাবে নাগরিক সমাজের উপর চেপে বসছে

সুমরিন কালিয়া, ফ্রাই ইউনিভার্সিটি, বার্লিন, জার্মানি

৩০ মার্চ ২০২২, করাচিতে টিএলপি সমাবেশে জড়ো হওয়া মানুষজন। ছবি: লেখক।

>>

ইউরোপজুড়ে এবং তার বাইরেও ডানপন্থীরা এখন আর প্রান্তিক শক্তি নয়। ডানপন্থী দলগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করেছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা, মানবাধিকার সংগঠনের ওপর দমন-পীড়ন চালানো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত সহিংসতাকে উৎস-াহিত করেছে।

কেন এবং কীভাবে চরম ডানপন্থী দলগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে? এই প্রশ্নগুলোকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে একাধিক গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। একদল গবেষক মনে করেন, বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে যে দ্রুত সাম-াজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা মানুষের মধ্যে অসন্তোষ এবং সাংস্কৃতিক উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে- যা চরম ডানপন্থী রাজনীতির উত্থানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। অন্যরা মনে করেন, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীলতা হ্রাস, শ্রেণিভিত্তিক ভোটাধিকারের দুর্বলতা, এবং গণমাধ্যম-কেন্দ্রিক রাজনীতির প্রসার উগ্র ডানপন্থার বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

> পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট

এই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক দেশের মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান, যেমন পাকিস্তানে। তবে সে দেশে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বমূলক প্রভাব এবং নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্বলতা উগ্র ডানপন্থি দলগুলোর সরাস-রি ক্ষমতায় আসাকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করেছে। তবুও, এসব দল ও গোষ্ঠীর ভাবধারা সমাজে বিস্তৃত হয়েছে, যার ফলে সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি নারীবাদী এবং প্রগতিশীল মতাদর্শের অনুসারীদের বিরুদ্ধেও বৈরিতা বেড়েছে।

এই প্রবন্ধে আমি যুক্তি দিয়েছি যে, চরম ডানপন্থী মতাদর্শের প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণ বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে 'নাগরিক সমাজ'-এর দিকে, যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি বিশাল ক্ষেত্র বিদ্যমান। এই ডানপন্থি দলগুলো আন্দোলন-কৌশল প্রয়োগ করে সমাজে বিরাজমান অসন্তোষকে কাজে লাগায়, তাদের ভাবনার পরিসর বাড়ায় এবং মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে।

আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য, আমি পাকিস্তানের একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের উদাহরণ বিশ্লেষণ করেছি। পাকিস্তান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে নাগরিক সমাজে ডানপন্থী মতাদর্শের স্বাভাবিকীকরণ পর্যবেক্ষণ করা যায়, কারণ দেশটির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গণতান্ত্রিক মানদণ্ড প্রয়োগে দুর্বল, এবং সামরিক বাহিনী নির্বাচিত পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়ছে নাগরিক সমাজেও, যেখানে ডানপন্থী দলগুলো শুধু প্রচলিত রাজনৈতিক মতামত গঠনে নয়, বরং সংঘাতপূর্ণ গণআন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।

পরবর্তী অংশে, আমি দেখাই কীভাবে ওই দলটি তাদের বর্জনমূলক মতাদর্শের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সামাজিক আন্দোলনের মতো কৌশল ব্যবহার করে। বিশেষ করে, আমি তিনটি কৌশল তুলে ধরবো, যা দলের নেতৃবৃন্দ, সদস্য এবং কর্মীরা তাদের আদর্শ ও সামাজিক মানদণ্ড বিস্তারে প্রয়োগ করে থাকে।

> তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)

তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি) নিজেকে একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে উপস্থাপন করে, যার প্রধান এজেন্ডা হলো ইসলাম, পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং কুরআন সম্পর্কিত অবমাননাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা, পাকিস্তানের ধর্ম অবমাননা আইন রক্ষা করা। এই দলটি ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। তারা সে বছর ২৬২ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ভোটের হিসাবে পঞ্চম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে টিএলপি আরও এগিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে আসে এবং পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামপন্থী দলগুলোকে পেছনে ফেলে দেয়। তবে টিএলপি-এর কার্যক্রম শুধুমাত্র নির্বাচনী রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। দলটি ধর্ম অবমাননা আইন সংস্কার নিয়ে যে কোনো ধরনের বিতর্কের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি তারা আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও সহিংস হামলার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছে, বিশেষ করে আহমদিয়া সম্প্রদায়, নারীবাদী কর্মী এবং অধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে।

পাকিস্তান নাগরিক সমাজে চরম ডানপন্থী ভাবনার বিস্তার বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কারণ এখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা পুরোপুরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠেনি, বরং তা মূলত নাগরিক সমাজের মধ্যেই সংঘটিত হয়। দেশটির বিচার বিভাগ, সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগ-এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক নীতিমালা কার্যকর করতে বেশ দুর্বল। এর একটি বড় কারণ হলো, সামরিক বাহিনী শুধু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা সীমিত করে রাখে না, বরং নাগরিক অধিকারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে, সমাজে চরম বৈষম্য, এলিটদের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণি-পুনর্বিন্যাসের অক্ষমতা সামাজিক অগ্রগতিকে স্থবির করে রেখেছে। বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং নারীবাদী গোষ্ঠীগুলোর যে কোনো রকম সক্রিয়তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ঐতিহাসিকভাবে নির্বাচনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। নির্বাচিতভাবে কিছু রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। অতীতে এই পৃষ্ঠপোষকতা মূলত দেওবন্দি ও সালাফি মতাদর্শের ইসলামপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামরিক প্রতিষ্ঠানের নীতিগত পরিবর্তন টিএলপি-এর উত্থানকে সহায়তা করেছে, তাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও বেশি জায়গা ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

> নাগরিক সমাজে হস্তক্ষেপের কৌশল

ইউরোপের অধিকাংশ চরম ডানপন্থী দলের মতো, তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি) নির্বাচনী কৌশল ও সামাজিক আন্দোলনের কৌশলকে একত্রে ব্যবহার করে। এর ফলে দলটি একদিকে যেমন আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, অন্যদিকে তেমনি নাগরিক সমাজের ভেতরেও সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অনেক চরমপন্থী দলই প্রাথমিকভাবে সাম-াজিক আন্দোলনের রূপে নাগরিক সমাজে গড়ে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই ধরনের "হাইব্রিড" দলগুলো আন্দোলন এবং নির্বাচনের দুটি পথেই সক্রিয় থাকে । এখানে রাজনৈতিক উদ্যোক্তা ও কর্মীরা উভয় কৌশলে বিনিয়োগ করে: একদিকে বিক্ষোভ, সংঘ-াতময় মবিলাইজেশন, অন্যদিকে প্রচলিত রাজনৈতিক মতপ্রকাশ ও সমর্থন গড়ে তোলা।

একটি আন্দোলন-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে, টিএলপি তিনটি নির্দিষ্ট কৌশল ব্যবহার করেছে যার মাধ্যমে তারা নাগরিক সমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই কৌশলগুলোকে আমি একত্রে বলছি: "নাগরিক সমাজে হস্তক্ষেপের কৌশল"। এই "হস্তক্ষেপ" বলতে আমি এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে বুঝাচ্ছি, যেখানে নাগরিক ও অ-নাগরিক সমাজের মধ্যকার সীমারেখা লঙ্ঘিত হয় এবং "অ-নাগরিক" অংশটি ধীরে ধীরে "নাগরিক" পরিসরে প্রবেশ করে, নিজস্ব চিন্তাধারা ও আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠা করে।

>>

> বর্ণনাপদ্ধতির পুনর্গঠন

টিএলপি ধার্মিক আখ্যানগুলোকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সেগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, নবী করিম (সা.) এর তায়েফ সফরের ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে ধৈর্য্য ও ক্ষমার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। কিন্তু টিএলপি-এর ক্যারিশম্যাটিক নেতা খাদিম হুসাইন রিজভী এই ঘটনাটিকে ঘৃণা ও প্রতিশোধের ভাষায় পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। একইভাবে, ঔপনিবেশিক ভারতের এক কিশোর মুসলমান ইলম দীন, যিনি এক হিন্দু প্রকাশককে হত্যা করেছিলেন, তাঁর গল্পটিকে টিএলপি কর্মীরা আইনের বাইরে সহিংসতা গৌরব করার উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এই ধরনের পুনর্ব্যাখ্যা শুধু বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। আবেগতাড়িত ভাষণ, সম্পাদিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিও, এবং এমন সব অলঙ্কারমূলক কৌশল ব্যবহার করা হয় যা ধর্মীয় আনুগত্যকে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একীভূত করে।

> নেটওয়ার্ক ব্রোকারেজ

টিএলপি তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য "গ্রাসরুট" বা তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে, যারা বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। এদের মাধ্যমে টিএলপি বিদ্যমান ধর্মীয় সংগঠন ও নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময়, টিএলপি -র কর্মীরা দাওয়াতে ইসলামী (ডিআই) এবং সুন্নি তেহরিক-এর মতো সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ব্যবহার করে প্রচারণা চালায়। একইভাবে, তারা আঞ্জুমান-ই-তুলবা-ই-ইসলাম (এটিআই)-এর মতো ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যেও তাদের বার্তা ছড়িয়ে দেয়, যা ফয়জাবাদে দলের অবস্থান কর্মসূচিতে জনসমর্থন গঠনে ভূমিকা রাখে। এই "ব্রোকার" বা মধ্যস্থতাকারীরা দলটির প্রভাবকে শুধুমাত্র নিজস্ব মতাদর্শিক ঘেরাটোপে সীমিত না রেখে ধর্মীয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছে।

> প্রতীকী পারফরম্যান্স

টিএলপি তাদের বর্জনমূলক চিন্তাভাবনাকে ধর্মীয় প্রতীক ও অনুশীলনের ভেতরে রোপণ করে, যাতে তা সাধারণ মানুষের মাঝে আরও গ্রহণযোগ্যতা পায়। করাচির বাহার-ই-শরিয়ত মসজিদের মতো ধর্মীয় স্থাপনাগুলোতে নিয়মিত ধর্মীয় সমাবেশগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। নবীর প্রশংসামূলক পাঠ বা নাত পাঠের মতো ধর্মীয় আচার টিএলপি-এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নতুন তাৎপর্য অর্জন করে। নির্বাচনী প্রচারে তারা "নালাইন শরীফ" (নবীর জুতা)-কে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে, আর নবীর প্রতি ভক্তি প্রকাশের একটি প্রচলিত প্রথা, অঙ্গুষ্ঠ চুম্বনের কাজটিকে ভোটদানের প্রতীকী অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

পাকিস্তানে সামাজিক বিভাজন, সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিকল্প আন্দোলনের দুর্বলতা, এই উপাদানগুলো টিএলপি-এর নাগরিক সমাজে প্রবেশকে সহজ করেছে। দলটি ১৯৫০ ও ১৯৭০ দশকের ইসলামপন্থী আন্দোলন, বিশেষ করে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলনের আখ্যানগুলো পুনর্গঠন করে নিজেদের "খাতমে নবুয়ত"ভিত্তিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের উত্থান আরও সহজ হয় পাকিস্তানের "হাইব্রিড" রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে; যেখানে সামরিক বাহিনী কিছু ধর্মীয় দলকে সহনীয়তা দেখায় ও পৃষ্ঠপোষকতা করে, আবার অন্যদের দমন করে। এর ফলে টিএলপি কেবল ব্রেলভি ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বিস্তৃত সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বামপন্থী দল এবং ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক দমন ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতির ফাঁদে আটকে থাকায় টিএলপি-এর বিকাশকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি।

যদিও পাকিস্তানের দুর্বল নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং ক্লায়েন্টভিত্তিক রাজনীতি টিএলপি-এর মতো দলের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়: এমন প্রেক্ষাপটে-যেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী, নাগরিক অধিকার রক্ষিত, এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠেছে; সেখানে কীভাবে নাগরিক সমাজে চরমপন্থী অনুপ্রবেশ ঘটে? শেষ পর্যন্ত, কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি মজবুত নাগরিক পরিসরও বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজে চরম ডানপন্থার অনুপ্রবেশ ও তাদের চিন্তার স্বাভাবিকীকরণ প্রতিহত করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: সুমরিন কালিয়া <sumrin.kalia@fu-berlin.de>

অনুবাদঃ
আলমগীর কবির, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি অনুষদ,
প্রিন্স অব শংক্লা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড।

> নাগরিক সমাজের প্রচারণার উপর জনতাবাদী শাসনব্যবস্থার

রোবের্তো স্কারামুজ্জিনো এবং **সেসিলিয়া সান্তিল্লি**, লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন

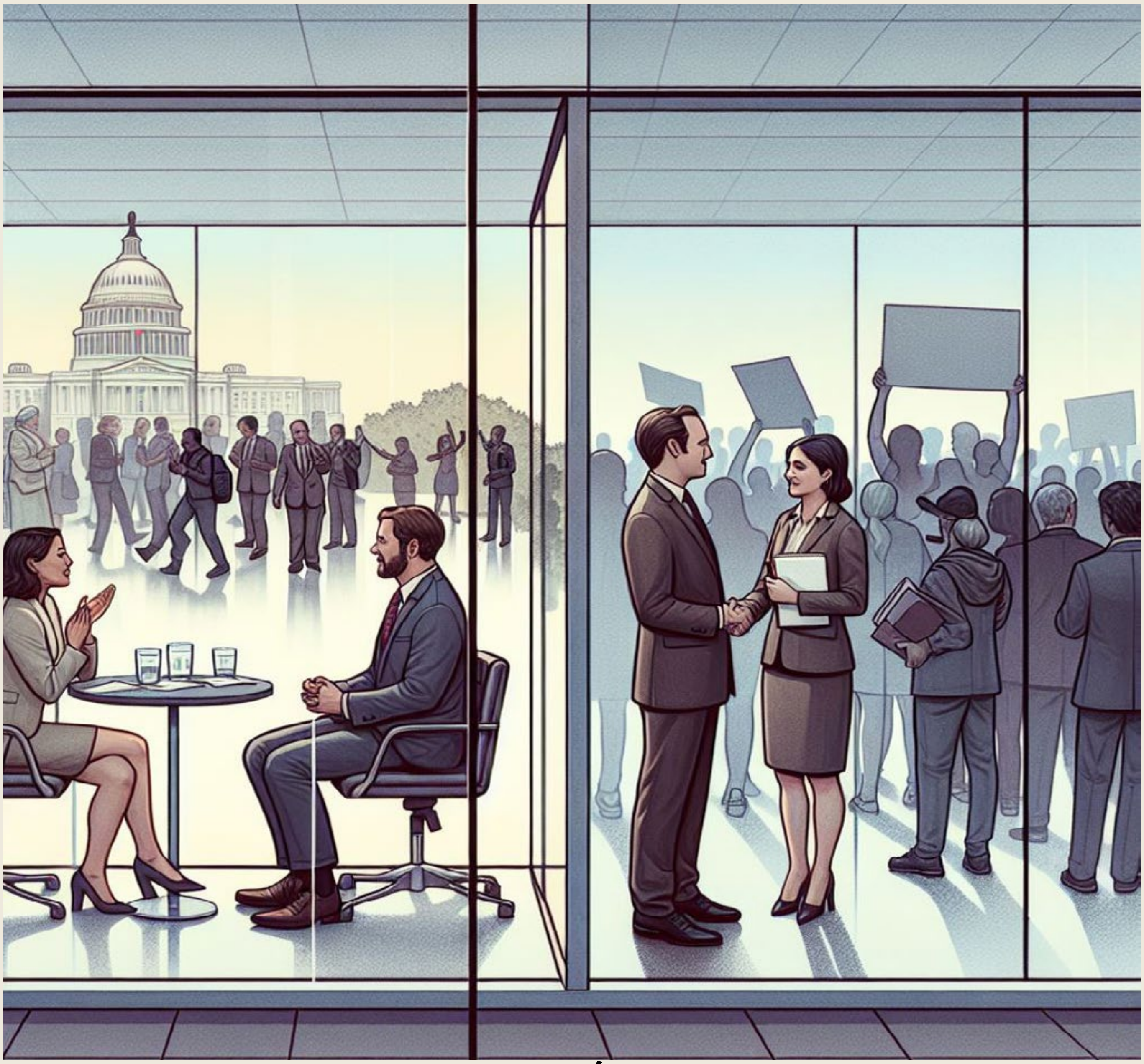

লবিং ও অ্যাডভোকেসির মধ্যে। ছবি তৈরি করেছেন লেখক, মাইক্রোসফট কপাইলট দিয়ে।

উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ডানপন্থী জনতাবাদী (পপুলিস্ট) দলগুলোর ক্ষমতায় আগমন গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূচনা করেছে। সুইডেন এ ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সক্রিয় নাগরিক সমাজ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের উচ্চ মাত্রার আস্থা বিদ্যমান। এমন একটি দেশেও ডানপন্থী জনতাবাদী দল, সুইডেন

>>

ডেমোক্র্যাটস, ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করে এসেছে। ২০২২ সালের নির্বাচনের পর এই দলটি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায়, সরাসরি প্রবেশাধিকার লাভ করে, যখন তারা একটি মধ্য-ডানপন্থী সরকারকে সমর্থন জানায়, যার নেতৃত্বে ছিল একটি উদার-রক্ষণশীল দল।

লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্কে সিভিল সোসাইটি নিয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সুইডিশ রিসার্চ কাউন্সিলের অর্থায়নে আমরা ২০২৪ সালে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করি, যার শিরোনাম 'সিভিল সোসাইটি ও পপুলিজম': পপুলিস্ট দলগুলোর ক্ষমতায় আসা কীভাবে রাষ্ট্র-নাগরিক সমাজ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এই প্রকল্পটি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে যেখানে দুটি দেশকে কেন্দ্র করে কাজ করেছে: সুইডেন ও ইতালি। ইতালি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, কারণ এটি একটি উদার গণতন্ত্র যেখানে ডানপন্থী পপুলিস্ট দলগুলো দীর্ঘদিন ধরে সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমরা প্রকল্পটির গবেষণা এজেন্ডা এবং সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব পলিটিক্স, কালচার অ্যান্ড সোসাইটি-তে প্রকাশিত একটি কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করছি।

> "উদার গণতন্ত্রে অ্যাডভোকেসির (পক্ষসমর্থন/পক্ষসমর্থনমূলক কার্যক্রম) কেন্দ্রীয় ভূমিকা"

উদার গণতন্ত্রে সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোর (সিএসও) অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো অ্যাডভোকেসি বা পক্ষসমর্থনমূলক কার্যক্রম। কিছু সংস্থার জন্য এটি অর্থ দাঁড়ায় তাদের সদস্যদের অধিকার বা স্বার্থ রক্ষা করা যেমন– নারী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি বা অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করা। অপরদিকে অন্য সংগঠনগুলো সরাসরি কোনো গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব না করেও বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করে, যেমন টেকসই উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা বা মানবাধিকার রক্ষা। অ্যাডভোকেসির এই ভূমিকা উদার গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, যা মুক্ত জন-আলোচনা এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগের পূর্বশর্ত মেনে চলে। ফলে, সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোকে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এ ধরনের অ্যাডভোকেসি ভূমিকা প্রায়শই, কিংবা অনেক সময় সরাসরি সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু ডানপন্থী পপুলিস্ট দলের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে । এসব দল সাধারণত নেতা ও জনগণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় এবং সিভিল সোসাইটি সংস্থার (সিএসও) মতো মধ্যস্থতাকারীদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যাদেরকে প্রায়ই দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে দেখা হয়। তাছাড়া, গত কয়েক দশকে যে সব সিএসও নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্জন করেছে, তাদের অনেকের উৎস এমন সামাজিক আন্দোলনে যা মানবিকতা, সংহতি, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে এসেছে। এই মূল্যবোধগুলো বহু ডানপন্থী পপুলিস্ট দলের জাতীয়তাবাদী, স্থানীয় মূল্যবোধ এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

> অ্যাডভোকেসি এবং সিএসও এর চার ধরনের প্রতিক্রিয়া

আমাদের গবেষণায় ইতালি ও সুইডেনের কার্যকরভাবে পরিচালিত সি-ভিল সোসাইটি সংস্থাগুলো (সিএসও) ২০২৪ সালে তাদের সরকারের বাজেট সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ধরণের বাজেট আইন শাসনকার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বিভিন্ন নীতির জন্য সম্পদ বরাদ্দ করে, যার মধ্যে সিএসও গুলোর জন্য অর্থায়নও অন্তর্ভুক্ত। বাজেট আইন অনেক সময় পপুলিস্ট শাসনব্যবস্থার একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, যেখানে পপুলিস্ট দলগুলো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করে।

আমরা কার্যকর সিএসওগুলোকে বেছে নিয়েছি কারণ তারা নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকে ও উল্লেখযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করে। যার কারণে পপুলিস্ট শাসনের ফলে আনা পরিবর্তনগুলো তাদের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে বিশেষত অর্থায়ন কমে গেলে তাদের কার্যক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। একই সঙ্গে, এই কার্যকর অবস্থান থেকে তারা সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে সক্ষম হলেও, তাতে তাদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থান হারানোর ঝুঁকি থাকে। তাই জনপ্রিয়তাবাদী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের অর্থায়ন কমে যায় তবে তাদের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভোকেসি কৌশল বোঝার জন্য আমরা নীতি পরিবর্তনের প্রতি সিএসও গুলোর প্রতিক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করেছি, যা দুটি মাত্রার ওপর ভিত্তি করে গঠিত–

১.সমালোচনার মাত্রা: গ্রহণযোগ্যতা থেকে প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত।

২.সমালোচনার বিস্তৃতি: নীতি-কেন্দ্রিক থেকে ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক পর্যন্ত।

এই দুটি মাত্রা একে অপরকে অতিক্রম করে চারটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিকল্প তৈরি করে, যা নিচের মডেলে দেখানো হয়েছে।

নীতি পরিবর্তনের প্রতি সিএসও-র প্রতিক্রিয়া

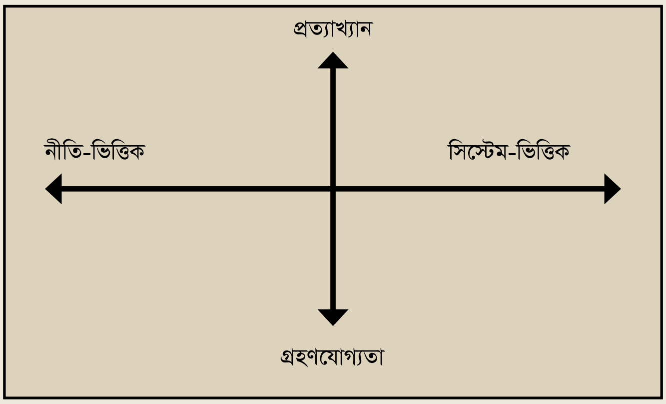

সূত্র: লেখকগণ।

এই মডেলটি উল্লিখিত দুটি মাত্রার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

নীতি-কেন্দ্রিক গ্রহণযোগ্যতা (নিচের বাম দিক) বেছে নেবে সেইসব , যারা মূলত বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা মেনে নেয়, কিন্তু নির্দিষ্ট নীতিগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে পারে।

অন্যদিকে, ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক গ্রহণযোগ্যতা (নিচের ডান দিক) বেছে নেবে সেইসব সিএসও, যারা বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোকে মেনে নিলেও কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পক্ষে সমর্থন জানায়।

আরও সংঘর্ষমূলক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, নীতি-কেন্দ্রিক প্রত্যাখ্যান (উপরের বাম দিক) বেছে নেবে সেইসব সিএসও, যারা পপুলিস্ট সরকারের নির্দিষ্ট নীতি বা উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু পুরো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে না। শেষ পর্যন্ত, ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক প্রত্যাখ্যান (উপরের ডান দিক) প্রযোজ্য হবে সেইসব সিএসও এর ক্ষেত্রে, যারা পপুলিস্ট শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোর বিরোধিতা করে এবং রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে।

>>

> ভিন্ন সংগঠনের (সি এস ও) ভিন্ন প্রতিক্রিয়া

আমাদের গবেষণায় আমরা চার ধরনের প্রতিক্রিয়ার সবগুলোর উদাহরণই পেয়েছি, যা নির্দেশ করে যে সিএসও গুলো পপুলিস্ট শাসনের পরিবর্তনগুলোর প্রতি তাদের সাংগঠনিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিছু নীতিগত ক্ষেত্র অন্যগুলোর তুলনায় এমন সংস্কারের জন্য কম বা বেশি সংবেদনশীল হতে পারে, যেগুলো সিএসওরা অনুকূল মনে করে না, এবং এতে তাদের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিনিধিত্বকৃত স্বার্থের উপর প্রভাব পড়তে পারে। নির্দিষ্ট নীতিগত ক্ষেত্রে সক্রিয় সিএসও গুলোর তুলনায়, যারা সমগ্র সিভিল সোসাইটি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তারা হয়তো আরও সংঘর্ষপূর্ণ অথবা আরও সতর্কমুখী প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। তাদের আদর্শবাক্য এবং মিশনের ওপর ভিত্তি করে, কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী-রক্ষণশীল এজেন্ডাকে বেশি হুমকি হিসেবে অনুভব করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেমনটি দেখা যায় শ্রমিক বা অভিবাসীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে।

এই ফলাফলগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, বিভিন্ন সি এস ও পপুলিস্ট শাসনের প্রতি ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে– এটি নির্ভর করে তারা সংস্কারের প্রভাব কেমন ভাবে উপলব্ধি করে, তাদের নীতিগত আগ্রহের ক্ষেত্র, তাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর, এবং তারা সিভিল সোসাইটি সেক্টরের কাঠামোর কোথায় অবস্থান করে তার ওপর।

> প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করে সিএসও এর প্রতিক্রিয়া

তুলনামূলক গবেষণার অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ হলো– আমাদের আগ্রহের ফলাফলের জন্য প্রাসঙ্গিকতা বা পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইতালি এবং সুইডেন দুটি স্থিতিশীল উদার গণতন্ত্রের মধ্যে থাকা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করে। ইতালীয় সিভিল সোসাইটি ঐতিহ্যগতভাবে প্রধানত সেবা প্রদানের দিকে মনোযোগী, যেখানে সুইডিশ সিভিল সোসাইটি মূলত প্রকাশ্য কার্যক্রম ও অ্যাডভোকেসি কেন্দ্রিক । ইতালিতে সিভিল সোসাইটি সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রের অর্থায়ন সাধারণত আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবেই হয়, আর সুইডেনে তা বেশি সরাসরি এবং রাষ্ট্র সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পপুলিস্ট দলগুলোর ধরণ, ঐতিহাসিক পথচলা এবং ক্ষমতায় প্রবেশের সুযোগও এই দুই দেশের মধ্যে ভিন্নতা বহন করে।

ইতালিয়ান ও সুইডিশ সি এস ও-গুলোর বাজেট আইনের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও, আমরা প্রতিটি দেশের ভেতরেই সি এস ও প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছি। উভয় দেশেই আমরা চার ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তিনটির উদাহরণ দেখতে পেয়েছি। দুই দেশের সি এস ও প্রতিক্রিয়া তুলনা করলে দেখা যায়, সুইডিশ সি এস ও গুলো সাধারণত পপ-লিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে আরও প্রবল বিরোধিতা এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা-কেন্দ্রিক সমালোচনা করে থাকে। যদিও আমাদের কেস স্টাডি সীমিত সংখ্যক সি এস ও (প্রতিটি দেশের জন্য ১১টি) নিয়ে করা হয়েছে, তবুও এই ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে, সিএসওদের পপুলিস্ট শাসনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রেক্ষাপট সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই পার্থক্যের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে ইতালিতে পপুলিস্ট শাসনের চলমান স্বাভাবিকীকরণ, যেখানে সিএসওগুলো দীর্ঘ সময় ধরে এই নীতিগুলোর মোকাবিলা করছে। এরকম একটি স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া হয়তো এখনও সুইডিশ সি এস ও -গুলোর উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইতালির সিভিল সোসাইটি ক্ষেত্র যদি সেবা প্রদানের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে, তবে সেটি সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে কম সক্রিয় হতে পারে, যা তুলনামূলকভাবে সুইডেনের অ্যাডভোকেসি-কেন্দ্রিক ক্ষেত্রের থেকে আলাদা।

পাবলিক প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখা যায়, যেখানে রাষ্ট্র সরাসরি সি-ভিল সোসাইটি অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন সুইডেনে, সেখানে বিরোধী সিএসওদের বাধা দেওয়ার জন্য পপুলিস্ট শাসনের প্রচেষ্টা সরাসরি প্রভাব ফেলে, যা স্বাভাবিকভাবেই তাদের থেকে আরও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া উস্কে দেয়।

> সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলো (সিএসও) কি পপুলিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিহত শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। লক্ষ্যণীয় যে, উদার শাসন ব্যবস্থাগুলো অনেক সময় সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোর (সিএসও) ওপর এমন স্থিতিশীল উদার গণতান্ত্রিক অবস্থাতেও কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা চালিয়েছে যেখানে সরাসরি পপুলিস্ট দলের কোনও সংযোগই ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেক সি এস ও নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার অনুভূতি পায় এটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ক্রমেই সীমিত হওয়া স্বাধীনতার সুযোগের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কঠোর নীতি যা অনেক গোষ্ঠী এবং বিষয়কে লক্ষ্য করে, যাদের সঙ্গে কার্যকর সিএসও -গুলো কাজ করে থাকে।

সিএসও -গুলো কতটা কার্যকর থাকার পাশাপাশি নীতিগত সমালোচনামূলক অবস্থান রাখতে পারে, এটি সিভিল সোসাইটি গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। পপুলিস্ট শাসনের সময় এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা গণতান্ত্রিক পশ্চাদপদ এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের দিকে পরিবর্তনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তদুপরি, পপুলিস্ট শাসন এবং ডানপন্থী বচনের স্বাভাবিকীকরণের কারণে সিএসও -গুলো সমালোচনামূলক অ্যাডভোকেসি কম করার প্রবণতা গ্রহণ করতে পারে।

পপুলিস্ট শাসনের সময় সিএসও -গুলোর কার্যক্রমের কাঠামোগত ও সাং-গঠনিক পূর্বশর্তগুলি এবং অন্যান্য জাতীয় প্রেক্ষাপটে তাদের ভূমিকা বোঝার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগ: রোবের্তো স্কারামুজ্জিনো <roberto.scaramuzzino@soch.lu.se>

অনুবাদক:
ফারহীন আক্তার ভুঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানেটিজ বিভাগ (সমাজবিজ্ঞান), মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

> ইতিহাস ও সামাজিক তত্ত্বে ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা

আনাহিদ আল-হারদান, হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, এবং **জুলিয়ান গো,** শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

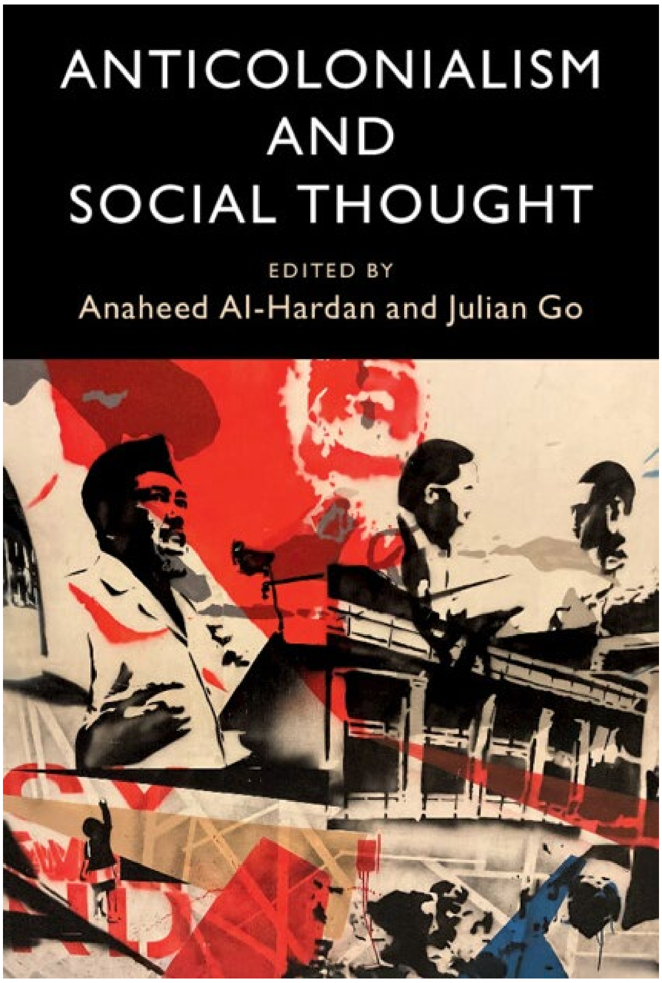

অ্যান্টিকলোনিয়ালিজম অ্যান্ড সোশ্যাল থট, সম্পাদনা: আনাহিদ আল-হারদান ও জুলিয়ান গো, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। অনলাইনে প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ: আগস্ট ২০২৫

সামাজিক তত্ত্বকে 'বিশ্বায়িত' করার, প্রভাবশালী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগুলোকে উৎখাত করার এবং প্রচলিত তাত্ত্বিক কাঠামোকে পুনর্বিবেচনা করার প্রচেষ্টা বহু দশক ধরেই চলমান রয়েছে। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই প্রকল্পের জন্য ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তাধারাকে একটি মূল উৎস হিসেবে সামনে আনা উচিত। ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা নতুন, সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চিন্তার জন্ম দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে, যা সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে বিবেচিত। বিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বকে পরিবর্তনের লড়াইয়ে যুক্ত থাকা অবস্থায়, ঔপনিবেশিক-বিরোধী কর্মীরা এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী সমালোচনা উপস্থাপন করেন। তারা সাম্রাজ্যের বর্ণবাদ, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক বর্জন এবং সামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। একই সঙ্গে, তারা যে বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন সেই বিশ্বকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন এবং নতুন ধারণা ও তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা সমাজকে বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক নতুন সামাজিক বিশ্লেষণ, ধারণা ও তত্ত্ব সৃষ্টি করেছে-যা একটি প্রকৃত সমালোচনামূলক এবং ভিন্নধর্মী সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার পরিচায়ক। আমরা প্রস্তাব করি যে, ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলন এবং চিন্তাবিদদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া হচ্ছে অনেক প্রভাবশালী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার একটি কৌশল।

> ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তার অবস্থান নির্ধারণ

পঞ্চদশ শতকে আমেরিকা মহাদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঘটে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বিংশ শতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় উপনিবেশবাদকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, যখন বিশ্বের অধিকাংশ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল উপনিবেশ বা সাবেক উপনিবেশ। সাম্রাজ্যবাদ আজও বিশ্ব কাঠামোতে বিদ্যমান আছে, কখনও প্রত্যক্ষ উপনিবেশের মাধ্যমে, কখনও নব্য ঔপনিবেশবাদের রূপে। তবে এটি সব সময়ই প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে-চাষি, বাধ্য শ্রমিক ও দাসদের থেকে শুরু করে লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের মাধ্যমে যারা ইউরোপীয়, এবং পরবর্তীতে মার্কিন আধিপত্য ও এর বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বর্তমানে যখন ঔপনিবেশিকতা ও নব্যঔপনিবেশবাদ টিকে রয়েছে, তখনও স্ট্যান্ডিং রক থেকে গাজা পর্যন্ত ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। এই বিরোধিতা এসেছে নানান রূপ ও জটিল ঐতিহাসিক ধারা নিয়ে, যেমনঃ আমেরিকায় বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী প্রতিরোধ, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হাইতির বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলোর পতনের সময় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম, কিংবা সাম্প্রতিক 'ব্লাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন এবং ফিলিস্তিনে ন্যায়বিচারের দাবিতে বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয় দখল আন্দোলন-এসবই ঔপনিবেশিক-বিরোধিতার বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। এটি একটি ধারাবাহিক সংগ্রাম, যা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।

যদিও ইতিহাসবিদরা ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করেছেন এবং তাদের জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে আলোকিত করেছেন, আমাদের লক্ষ্য হলো ঔপনিবেশিক-বিরোধিতার তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemic) দিকগুলো পুনরুদ্ধার করা। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত আমাদের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত এন্টিকলোনিয়ালিজম এন্ড সোশ্যাল থট শীর্ষক একটি আসন্ন গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপনিবেশবাদ অভিনব, উদ্ভাবনী এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চিন্তাভাবনার জন্ম দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে। ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা দীর্ঘদিন ধরেই এমন এক সক্রিয় ক্ষেত্র, যা একটি সামাজিক কল্পনাশক্তিকে ধারণ করে এবং তা আজও প্রাসঙ্গিক। আমরা যুক্তি দিই যে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেছে যা সামাজিক চিন্তা ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের একটি আলাদা ঘরানা।

>>

তাই আমরা প্রস্তাব করি, ইতিহাসে উদ্ভূত ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তাধারাকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উৎস হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আমরা ঔপনিবেশিক-বিরোধিতাকে একটি রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, যা কিছু নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি বহন করে-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে সৃষ্ট বৈষম্যকে উল্টে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই অবস্থানটি মূলত সাম্রাজ্যের দ্বারা উপনিবেশিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত এবং সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমানেও, এই অবস্থানটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্যোগের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রকে ধারণ করে। আমাদের প্রকল্প হলো এই অবস্থানের সামাজিক-এবং সমাজতাত্ত্বিক-মাত্রাগুলো পুনরুদ্ধার করা।

> সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করা

আমাদের অবদানের পেছনে দুটি প্রধান ভিত্তি রয়েছে। প্রথমত, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিজ্ঞানে প্রচলিত অধিকাংশ সামাজিক তত্ত্ব একটি দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং সূক্ষ্ম কিংবা স্পষ্টভাবে একটি 'সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' ধারণ করে। আজকে যাকে সমাজ-বিজ্ঞান বলা হয় এবং যার বিমূর্ত নীতিমালার রূপ হলো 'সামাজিক তত্ত্ব', তা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী বৈশ্বিক সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছে-যেমনটি আগের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে জন্ম, সাম্রাজ্যবাদ থেকেই উৎপত্তি, এবং সাম্রাজ্যের জন্য গঠিত এই সামাজিক তত্ত্ব তাই নির্দিষ্ট ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, স্বতন্ত্র ধারণা ও তত্ত্ব নির্মাণ করেছে এবং এমন গবেষণা পরিচালনা করেছে যা সাম্রাজ্যবাদী রাজধানীর অভিজাত শ্রেণির স্বার্থ, উদ্বেগ ও অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করেছে। যেখানে সাম্রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবিরোধী কণ্ঠস্বর ছিল, যেমন ডব্লিউ. ই. বি. ডু বোয়িস-এর মতো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে, সেগুলোকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আজকের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এখনো পূর্ববর্তী যুগের সাম্রাজ্যবাদী ছাপ বহন করে চলেছে-যা তাদের বিশ্লেষণাত্মক বিভাগ, মৌলিক অনুমান এবং গবেষণা প্রশ্নে প্রতিফলিত হয়; যেগুলো এখনো সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলোর স্বার্থ ও উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়। একটি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গঠিত হওয়ায়, প্রচলিত সামাজিক তত্ত্বের ধারাগুলো এখনো তার প্রাদেশিকতা, অবলুপ্তি এবং অন্ধ স্থানগুলোতে আবদ্ধ। অনেক সমালোচক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-তত্ত্ব নির্মাণ থেকে শুরু করে গবেষণা পদ্ধতি পর্যন্ত - সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে বেগ পোহাতে হয়েছে। এটি ইউরোকেন্দ্রিকতা এবং ওরিয়েন্টালিজম থেকে মুক্ত হতে পারেনি, বরং বিশ্বের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, স্বার্থ এবং উদ্বেগকে উপেক্ষা করে এসেছে। একই সঙ্গে, সামাজিক তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্র এখনো সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টির অল্প কিছু ধারণ করে চলেছে-ফলে এটি মৌলবাদী (essentialist) ধ্যানধারণা, বিশ্লেষণাত্মক বিভাজন এবং মেট্রোসেন্ট্রিক (metrocentric) অনুমানজনিত সমস্যায় পড়ে যায়। এর মধ্যে তথাকথিত 'সমালোচনামূলক' হিসেবে বিবেচিত প্রভাবশালী তত্ত্ববিদদের তত্ত্বও অন্তর্ভুক্ত, যেমন ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের চিন্তাবিদগণ থেকে মিশেল ফুকো পর্যন্ত। এমনকি তথাকথিত 'উপনিবেশোত্তর' বিশ্বেও সামাজিক তত্ত্ব এবং আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞান এখনও ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার বহন করে। কারণ, বিশেষ করে বিশ্বের অনেক দেশে সামাজিক বিজ্ঞান প্রথম গঠিত হয়েছিল ইউরোপীয়, এবং পরে মার্কিন সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীন প্রেক্ষাপটে।

দ্বিতীয় ভিত্তি হলো-সামাজিক তত্ত্বের উৎসগতভাবে সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর উত্তরাধিকার অতিক্রম করতে হলে, কেবল প্রচলিত পন্থায় সমাজবিজ্ঞানকে কম প্রাদেশিক, আরও বৈশ্বিক এবং বিশ্বের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার জন্য অধিকতর উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টার বাইরে যেতে হবে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে 'আদিবাসী সমাজবিজ্ঞান', 'দক্ষিণের তত্ত্ব', বা 'দক্ষিণের জ্ঞানতত্ত্ব' নামে পরিচিত বিভিন্ন প্রকল্প। অন্য কিছু উদ্যোগ ইউরোপের বাইরের অঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে 'স্বাধীন ধারা' হিসেবে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পসমূহ নিঃসন্দেহে মূল্যবান এবং সমাজবিজ্ঞানকে বিশ্বায়নের পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে, আমাদের মতে এগুলোর নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে- যা ইতিহাসে নিহিত ঔপনিবেশিক-বিরোধিতাকে সামাজিক চিন্তার এক সমসাময়িক প্রাসঙ্গিক উৎস হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব।

> আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ভূরাজনীতি ঔপনিবেশিক-বিরোধী তত্ত্ব বা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির জন্য অপরিহার্য নয়

বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো, সেগুলো একটি সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত সমস্যার ইউরোকেন্দ্রিকতার উপরে কেন্দ্রীভূত, এবং সে অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে। এই পদ্ধতিগুলোর মতে, প্রভাবশালী সামাজিক তত্ত্বের সমস্যা হলো এটি ইউরোপ বা 'পশ্চিমা' বিশ্বে উৎপত্তি হয়েছে। তাই সমাধান হিসেবে অনুসন্ধান করা হয় 'অপশ্চিমা' বা 'অ-ইউরোপীয়' চিন্তাধারা বা চিন্তাবিদদের। এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো 'অপশ্চিমা', 'আদিবাসী', 'এশীয়', 'আফ্রিকান' বা 'দক্ষিণের' চিন্তাবিদদের খুঁজে বের করা এবং ব্যবহারের মাধ্যমে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর গড়ে তোলা যা 'পশ্চিম' বা 'গ্লোবাল নর্থ' এর 'বাইরে' বা 'বহির্ভূত'। এই ধরনের পদ্ধতিগুলো মূলত চিন্তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুর থেকে ভৌগোলিক উৎসকে চ্যালেঞ্জ করে-এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে একটি চিন্তার বিষয়বস্তু তার ভৌগোলিক উৎস দ্বারা নির্ধারিত। অর্থাৎ, যদি কোনো সামাজিক চিন্তাবিদের অবস্থান বা উৎস 'অপশ্চিমা' বা 'অ-ইউরোপীয়' হয়, তাহলে শুধুমাত্র সেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাঁর চিন্তা অবশ্যই মূল্যবান বলে ধরে নেওয়া হয়।

ভূগোল ভিত্তিক ইউরোপীয় সামাজিক বিজ্ঞানের এই সমালোচনাগুলো নিঃসন্দেহে কিছুটা যৌক্তিক। ঐতিহাসিকভাবে, সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি একটি বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিকে প্রায় অনুবাদ করেছে যেখানে এর পুঁজিবাদী কেন্দ্র - ইউরোপ এবং পরে যুক্তরাষ্ট্র, যাদের সাধারণত 'পশ্চিম' এবং সাম্প্রতিককালে 'গ্লোবাল নর্থ' বলা হয়। এটি 'পূর্ব' বা সাম্প্রতিক 'গ্লোবাল সাউথ'-এর উপর বস্তুগত এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

তবে, এই বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির সাধারণ ভৌগোলিক বিভাজন সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলোর অন্তর্গত ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদের শিকারদের বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আদিবাসী সম্প্রদায় এবং উপনিবেশিক ও দাসত্বভোগী সম্প্রদায়ের অন্যান্য বংশধররা গ্লোবাল নর্থ-এর পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথেও বসবাস করে। তদুপরি, ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশবাদীরা এবং তাদের বংশধররাও পূর্বে বা বর্তমানে উপনিবেশিত অঞ্চলে বসবাস করছে।

এই সম্পর্কিত আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো, ভৌগোলিক অবস্থানগুলো সরলভাবে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা জ্ঞান গঠনের সাথে মেলানো যায় না। সকল সামাজিক চিন্তাবিদ কিংবা পূর্বে উপনিবেশভুক্ত বিশ্ব থেকে উদ্ভূত সকল তত্ত্বই ঔপনিবেশিক-বিরোধী নয়। উপনিবেশভুক্ত বিশ্বের সামাজিক বিতর্ক এখনও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্গত করতে পারে, যা প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের ফল-যা সাম্রাজ্যবাদী অনুমানকে ছড়িয়ে দিতে ও প্রতিষ্ঠানভুক্ত করতে সাহায্য করেছে। এবং দ্বিতীয়ত, সমকালীন জ্ঞান উৎপাদনের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বিন্যাসের ফল, যা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে সেবা করে এবং নব্যঔপনিবেশিক বিশ্বব্যাপী জ্ঞান উৎপাদনের কাঠামোকে পুনরুৎপাদন করে। একই কারণে, 'ইউরোপ' বা 'গ্লোবাল নর্থ'- এর সকল তাত্ত্বিক অবশ্যই

>>

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নির্ধারিতভাবে প্রধানত ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানব্যবস্থার অংশ নয়। তাদের সবাই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সমর্থক ছিল না, এবং এখনও সমর্থন করে না; তারা প্রয়োজনীয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করেন না। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন, বিশেষ করে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রভাবিত আন্দোলনগুলো রাজধানীগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উপনিবেশগুলোর কমরেডদের সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের বইতে এই দৃষ্টান্তমূলক ও উৎপাদনশীল ধারণার বিস্তার এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিক-বিরোধী রাজনৈতিক ধারার পুনর্ব্যক্তকরণের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুতরাং, এই অঞ্চলভিত্তিক পদ্ধতিগুলো যা করতে ব্যর্থ হয় তা হলো সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প প্রদান বা তার সমালোচনা করা; এর ফলে তারা অনিচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদী অনুমানগুলোর পুনরুৎপাদন করে। এই পদ্ধতিগুলো অঞ্চল, সংস্কৃতি, জনগণ বা সমাজকে পৃথক ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বিভক্ত করে এবং সেই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ক্ষেত্রগুলোর কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধরে নিয়ে থাকে। এই 'জিওএপিস্টেমিক এসেনশিয়ালিজম' আসলে সেই ধরনের এসেনশিয়ালিজমের প্রকাশ যা দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানব্যবস্থার অংশ, এবং যার বিরুদ্ধে এডওয়ার্ড সাইদ বহু আগে সতর্ক করেছিলেন, বিশেষ করে তাঁর ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে।

> ঔপনিবেশিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিশ্রুতি

আমরা নির্দিষ্ট চিন্তাবিদ বা তত্ত্বের ভাষাগত ও বাচনগত ঐতিহ্যকে অবহেলা করি না, এবং দাবি করি না যে ধারণার বিকাশ ও প্রচারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তবুও, আমরা যুক্তি দিই যে ঔপনিবেশিক-বিরোধী বা ভিন্নমতাবলম্বী সামাজিক তত্ত্ববিদ ও সামাজিক তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র ভূগোল এবং পরিচয় যথেষ্ট নয়। সুতরাং, আমাদের গ্রন্থে সামাজিক চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকদের বোঝাপড়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত, ভৌগোলিক পরিচয় বা অবস্থানের প্রেক্ষিতে নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও এর প্রধান উপনিবেশবাদ ও নব্য ঔপনিবেশবাদের রূপের বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত ঔপনিবেশিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু, যা একটি বৈচিত্রময় সামাজিক চিন্তা ও তত্ত্বের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে এবং ফলপ্রসূভাবে "ঔপনিবেশিক-বিরোধী" হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

'আদিবাসী', 'অ-পশ্চিমা', অথবা অন্যান্য ধরণের চিন্তাভাবনার বিপরীতে যা কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প পুনরুদ্ধার করতে চায়, ঔপনিবেশিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই চিন্তাধারা কখনোই তথাকথিত পশ্চিমা চিন্তার 'বাইরে' বা 'বহির্ভূত' নয় এবং হতে পারে না। বরং, ঔপনিবেশিক চিন্তাবিদগণ ইউরোপীয় ঐতিহ্যবাহী চিন্তার সঙ্গে সমালোচনামূলকভাবে যুক্ত ছিলেন যখন তারা ইউরোপীয় এবং পরে মার্কিন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। ঔপনিবেশিক চিন্তা ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা ও ভাষ্যর সঙ্গে একটি সমালোচনামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে। মার্কসবাদী চিন্তা, মেট্রোপলিটান সমাজবিজ্ঞান বা ইউরোপীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাকে সম্প্রসারিত বা সংশোধন করার জন্য ঔপনিবেশিক চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টা এটির জ্বলন্ত উদাহরণ। তদুপরি, ঔপনিবেশিক চিন্তা 'গ্লোবাল সাউথ'-এর একক কোনো ভৌগোলিক স্থান বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং এখনো তা নয়। ঔপনিবেশিক সামাজিক চিন্তাবিদ ও তাদের ভাবনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, মেট্রোপোল ও উপনিবেশের মধ্যে এবং উপনিবেশিক বিশ্ব জুড়ে। এর একটি উদাহরণ হলো মাওবাদ, যার ভাবনা চীনের ঔপনিবেশিক ও বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও এশিয়ার ঔপনিবেশিক চিন্তাবিদ ও কর্মীদের মধ্যে গৃহীত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এটি কেন্দ্রের ক্ষমতা কাঠামোর সম্পর্ককে অস্বীকার নয়; বরং এটি স্বীকার করা যে ঔপনিবেশিক সমাজতাত্ত্বিকরা এমন তত্ত্ব ও চিন্তার ধারা গড়ে তুলেছিলেন যা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রচারিত হয়েছিল, এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কগুলো ছিল শীর্ষস্থ এবং প্রয়োজনীয়ভাবে সবসময় অনুভূমিক নয়।

> ঔপনিবেশিক-বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা আগের মতোই তীব্র

আমরা ঔপনিবেশিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিরঞ্জিতভাবে বা নির্বিচারে মূল্যায়ন করি না। ঔপনিবেশিক বিশ্বের পুনর্বিন্যাসের ঔপনিবেশিক-বিরোধী কাজ কখনই নিখুঁত বা বিশুদ্ধ ছিল না। পাশাপাশি সত্য যে, ঔপনিবেশিক চিন্তার কিছু বিষয় অপরিহার্য পরিচয় দাবি, অথবা শ্রেণিবিন্যাসমূলক ও মৌলবাদী প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিল না। আমরা ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তার প্রতি আগ্রহী না, কারণ আমরা ধারণা করি এটি রাজনৈতিক বা মতাদর্শগতভাবে নির্মল; তাছাড়াও এর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনার কারণে। এটি অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা, ধারণা ও বিভাগ প্রদান করে; এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমস্যা উত্থাপন করে যা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানে এর প্রকাশ আটকে দেয় ও উপেক্ষা করে।

সব শেষে, আমরা বলতে চাই না যে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা শেষ হয়ে গেছে। আজও অব্যাহত উপনিবেশবাদ এবং নবঔপনিবেশবাদের রূপে সাম্রাজ্যবাদ বিদ্যমান। এখনও এমন কিছু অঞ্চল আছে যা আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশের অধীনে রয়েছে। পুয়ের্তো রিকো, মার্টিনিক, এবং অ্যাঙ্গুইলা এর কিছু উদাহরণ। বাস্তবে, জাতিসংঘ ষোলটি অঞ্চলকে এখনও উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে মোট আনুমানিক দুই মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। অন্য একটি উদাহরণ হলো ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তির চলমান সংগ্রাম, যা ইহুদি বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। প্রকৃতপক্ষে, অতীতের মতোই, বিভিন্ন রূপে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আজও নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক-বিরোধী প্রতিরোধ দেখা যাচ্ছে। সেই প্রতিরোধ মেট্রোপোলের অন্তরে এবং আমাদের নবঔপনিবেশিক বিশ্বে উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই পরিস্থিতি শক্তিশালী তাত্ত্বিক সরঞ্জাম এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি রাখে, যা আমরা মনে করি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক সামাজিক চিন্তা ও তত্ত্ব থেকে আহৃত হতে পারে, এবং যা আগের মতোই অপরিহার্য। ■

সরাসরি যোগাযোগ: জুলিয়ান গো <jgo34@uchicago.edu>

অনুবাদঃ
মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

> ডার্সি রিবেইরো এবং দক্ষিন থেকে একটি বৈশ্বিক তত্ত্ব

অ্যাডেলিয়া মিগলিভিচ-রিবেইরো, ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ এস্পিরিটো সান্টো, ব্রাজিল

ডার্সি রিবেইরো ও অস্কার নিয়েমায়ার, ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএনবি) সফরকালে, ১৯৮৫। ক্রেডিট: সেন্ট্রাল আর্কাইভ/ইউএনবি।

ডার্সি রিবেইরো (১৯২২-১৯৯৭), ব্রাজিলিয়ান সামাজিক বিজ্ঞানী ও গণ বুদ্ধিজীবি, প্রায় ১,০০০ পৃষ্ঠার লিখিত রচনার একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার রেখে গেছেন। যদিও তাঁর রচনা কয়েক ডজন ভাষায় ৯০ টি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে-- ল্যাটিন অ্যামেরিকার লেখকদের মধ্যে এটি একটি বিরল অর্জন, তথাপি ব্রাজালিয়ান অ্যাকাডেমিয়াতে, এটি এখনও অনাবিষ্কৃত। তাঁর তত্ত্বসমূহ নিয়ে তুলনামূলক নীরবতা লক্ষ্য করা যায়, যার একটি কারণ হতে পারে মতাদর্শগত দ্বিমত এবং ‘অঙ্গীকারবদ্ধ বুদ্ধিজীবী’র প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন ও সাধারণ তত্ত্বের প্রতি তাঁর অবিচল প্রতিশ্রুতি-যা সে সময়ে অগ্রহণযোগ্য মনে করা হতো, যখন এ ধরনের প্রচেষ্টা অনেকটাই সেকেলে বলে বিবেচিত হতো।

১৯৬৪ সালে যখন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উচ্ছেদ হয়, তখন রিবেইরো ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জোয়াও গৌলাটের পক্ষে অবস্থান নেন। গৌলাটের মতো, তিনিও নির্বাসনে যান, ঐ সময় তিনি নিজেকে একজন

>>

'ল্যাটিন অ্যামেরিকার নাগরিক' বলে পরিচয় দেন। ১৯৭৯ সালের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে তিনি ফিরে আসেন এবং এরপর তিনি ব্রাজিলিয়ান লেবার পার্টি (পিটিবি) তে যোগদান করেন এবং গণতন্ত্রের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

> একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিঃ সভ্যতাগত প্রক্রিয়া

ল্যাটিন অ্যামেরিকার কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাসমূহ এবং ক্রমাগত উন্নয়ন বিলম্বের কারণ বোঝার একটি প্রেরণার মাধ্যমে রিবেইরো তাড়িত হন যাকে তিনি তার জনগণকে একটি 'বহিরাগত প্রলেতারিয়েত' মর্যাদায় পরিণত করা হিসেবে দেখছেন। তবুও, এই ঐতিহাসিক এককতা উপলব্ধি করার জন্য, তিনি প্রথমে ল্যাটিন অ্যামেরিকাকে একটি বৈশ্বিক সভ্যতাগত প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রায় ১৪,০০০ বছরের উন্নয়নের বিকাশ ধারার পর্যালোচনা করেন।

আদিবাসীদেরকে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা কিভাবে বিভক্ত করব, উন্নত সভ্যতা থেকে শুরু করে প্রাক-কৃষি দল পর্যন্ত যারা তাদের মাধ্যমে অর্জিত উন্নয়নের স্তরানুযায়ী জয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে? আদিবাসী জনগণ ও ইউরোপবাসীদের এবং আফ্রিকীয়রা যারা উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত হয়ে আমেরিকায় দাস শ্রমিকে রূপান্তরিত/স্থানান্তরিত হল আমরা কিভাবে তাদের অবস্থান নির্ধারন করব? ইউরোপবাসী যারা বিজয় অর্জন করেছে তুমি কিভাবে তাদেরকে বিভক্ত করবে? আইবেরিয়ান, যারা প্রথমে এসেছিল এবং নর্ডিক, যারা পরবর্তীতে এসেছিল-- বিশাল এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল-- তারা কি একই ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক গঠনের ধরনকে প্রতিনিধিত্ব করে? পরিশেষে, কৃষি-বানিজ্যিক সভ্যতা এবং এখনকার, শিল্প বিপ্লবের জীবন ধারায় তাদের অর্ন্তভূক্তির মাত্রার উপর ভিত্তি করে আমরা কিভাবে আমেরিকার জাতীয় সমাজসমূহকে বিভক্ত ও বর্ণনা করব?

তার যৌবন কালে, রিবেইরো মার্ক্সের এ্যহঃবৎৎরংব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে নিকট প্রাচ্যের প্রাচীন জলসেচ নির্ভর সভ্যতাসমুহের তার ব্যাখ্যর মাধ্যমে। এ ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থায় জমির মালিক ছিলেন ফেরাউনরা এবং কৃষি পরিকল্পনা ও শ্রম বন্টন নির্ধারিত এবং পরিচালিত হত আমলাদের মাধ্যমে। রিবেইরো প্ররোচনামূলকভাবে আইবেরিয়া ও আমেরিকাকে এই বৈশ্বিক সভ্যতার কাঠামোতে সন্নিবেশিত করেছিলেন এবং সমালোচকদের প্রতি উত্তরে বলেছিলেন: "তবুও, আমি এটা বিশ্বাস করার অধিকার রাখি যে, সবকিছু সত্ত্বেও, আমি মার্ক্সের উত্তরাধিকারী"।

সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পর্যবেক্ষকের অবস্থান উভয় দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে মত দেন। মার্ক্সের মতো, রিবেইরো রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্বল করে পর্যবেক্ষন, তুলনা, এবং ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। "এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা The Civilization Process রচনা করেছিলাম"।

তার প্রথম দিকের রচনায়, চৌদ্দ সহস্রাব্দ ধরে বারোটি সভ্যতাগত প্রক্রিয়া এবং আঠারোটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপরেখাসমূহ চিহ্নিত করার মাধ্যমে রিবেইরো প্রযুক্তির একটি সমালোচনামূলক ইতিহাস প্রস্তত করেন। অতিসাধারণীকরণের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্বেও, তিনি সামগ্রিকতার তত্ত্বায়নের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন-- যেখানে সমকালীন ও কালানুক্রমিক বিশ্লেষনের সংশ্লেষণ হয়। তার লক্ষ্য ছিল একটি জুতসই/বলিষ্ঠ তুলনামূলক রূপরেখা তৈরি করা যা শ্রেণিবিন্যাসমূলক ক্রমানুসার এড়িয়ে যাবে এবং তার পরিবর্তে সম্পর্ক নির্ভর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করবে।

>একক সভ্যতাগত প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহ

রিবেইরো বহুরৈখিক নব্য-বিবর্তনবাদ (ধ্রুপদী বিবর্তনবাদ থেকেস্বতন্ত্র) গ্রহণ করেন, নিজেকে একরৈখিক ও পরমকারণমূলক মডেল থেকে আলাদা করেছেন। তিনি ইতিহাসের একটি বিবর্তনীয় ধারণার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন- "যা অগত্যা বিবর্তনবাদী নয়" যা তিনি মনে করেছেন সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য অপরিহার্য যেখানে শিল্প ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ অর্ন্তভূক্ত। তাঁর মতে, বিবর্তন বলতে বোঝায় যে কিভাবে গোষ্ঠীসমূহ তাদের পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সৃজনশীলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব গড়ে তোলে, যা তুলনামূলকভাবে অভিন্ন কাঠামো কিন্তু অস্থায়ী হিসেবে দানা বাঁধতে পারে।

রিবেইরো বিমূর্ততার একাধিক স্তর জুড়ে কাজ করেছেন। তিনি সভ্যতাগত প্রক্রিয়ার (আলফ্রেড ওয়েবারের অনুরূপ) ধারনাটি ব্যবহার, একক সভ্যতাগত প্রক্রিয়াসমূহের (সোরোকিনের সাংস্কৃতিকগত অধি-ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) উপর আলোকপাত, এবং গর্ডন চাইল্ড ও লেসলি হোয়াইটের আলোচিত বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তুলনায় প্রযুক্তিগত বিপ্লবসমূহকে সীমিত পরিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এটিকে 'সাংকৃতিক-ঐতিহাসিক বিন্যাস' বলেছেন যাকে জুলিয়ান স্টুয়ার্ড সাংস্কৃতিক বাস্তুবিদ্যার উপর তাঁর গবেষণায় সাংস্কৃতিক প্রকার বলে অভিহিত করেছেন।

রিবেইরো প্রযুক্তিগত বিপ্লব বলতে প্রকৃতির সাথে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন, সমাজের গুণগত পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। শক্তি ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বিপ্লবগুলি সভ্যতাগত পথকে বাতলে দিয়েছিল, যা শর্তসাপেক্ষ কিন্তু মানুষের মাধ্যমেই আবার বাতলে দিয়েছিল। বিবর্তনের ধাপসমূহ রৈখিকভাবে সংঘটিত হয়নি বরং পরিবেশগত জটিলতার সাথে সফলভাবে খাপখাওয়ানোর মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি কখনই বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না বরং একটি ত্রিমুখী ব্যবস্থার অংশ, প্রতিটির একটি অভ্যন্তরীন কাঠামো ছিল: ক) অভিযোজিত ব্যবস্থা: জীবনের বস্তুগত অবস্থার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন; খ) সহযোগী ব্যবস্থা: উৎপাদন সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ; গ) আদর্শগত ব্যবস্থা: প্রতীকী যোগাযোগ/ভাষা, জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম, জীবন প্রণালী, এবং আচরণের সকল ধরন।

> প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণ এবং বিবর্তনীয় ত্বরণ

রিবেইরো গুরুত্ব সহকারে বলেন যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহ অভ্যন্তরীনভাবে উদ্ভূত হতে পারে অথবা বিচ্ছুরণের মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে। প্রতিটি সভ্যতার তাঁর নিজস্ব গ্রহণের অনন্য পদ্ধতি ছিল। তিনি ইহা থেকে দুইটি ধারণা আবিষ্কার করেনঃ প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণ/ ঐতিহাসিক অন্তর্ভুক্তি, এবং বিবর্তনীয় ত্বরণ।

প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণ নির্দেশ কওে "প্রযুক্তিগতভাবে আরোও বিকশিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সাথে মানুষের বাধ্যতামূলক সম্পৃক্ততা, যা থেকে স্বায়ত্তশাসন হ্রাস পাবে অথবা এমনকি এর ধ্বংসকে একটি জাতিগত সত্ত্বা হিসেবে দেখা হবে"। অন্তর্ভুক্তি বা প্রতিফলনের ধারণা ব্যাখ্যা করে কীভাবে কিছু পশ্চাদমুখী আন্দোলন অগ্রগতির আড়ালে লুকিয়ে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা অগ্রগতি নয়। বিবর্তনীয় ত্বরণ ধারনাটি প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণ/ ঐতিহাসিক সংযোজন এর বিকল্প।

প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণ/ ঐতিহাসিক সংযোজন হল স্থবিরতা, উন্নয়ন নয়। রিবেইরোর মতে, প্রকৃত উন্নয়ন বলতে মানুষের নিজেদের নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারন করার ক্ষমতা থাকাকে বোঝায়।

>>

দারিদ্র্য, ক্ষুধা, গণহত্যা, এবং প্রজাতি বিলুপ্তি সমালোচক বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিতে কখনোই অগ্রগতির একটি চিহ্ন হতে পারে না। 'যা পরে আসে' তা সবসময় বৃহত্তর সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় না, এর একটি উদাহরণ হল -'একটি দক্ষ প্রযুক্তির অতিব্যবহার' দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ । ধসে পড়া ব্যবস্থাগুলো আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অর্থবহ অগ্রগতি তৈরি করতে পারেনিবরং, তারা তাদের দ্বারা পরাভুত হয়েছিল- স্থবির হয়েছিল , পশ্চাদমুখী হয়েছিল , এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল।

অবনতির আহ্বানের মধ্যে এই সূক্ষ্মদৃষ্টিগুলি আজও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অসমতাকে আরোও ব্যাপিত এবং দুর্বল সমাজসমূহকে ক্ষতি করতে পারে। ইউরোপের উন্নতি, উদাহরণস্বরূপ, উপনিবেশিক সংহিসতার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছিল, যেখানে দক্ষিণ বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা/দেশসমূহ গভীরতর দারিদ্র্য, যুদ্ধ, বিপর্যয়, এবং ক্রমাগত সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল।

>ডার্সি রিবেইরো এবং সমসাময়িক বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান

আজ রিবেইরোর কাজ পুনর্বিবেচনা কেন্দ্র ও প্রান্তিক সম্পর্কিত বৈশ্বিক সমাজতাত্ত্বিক বিতর্ককে সমৃদ্ধ করে। রিবেইরো এগুলিকে স্থির অবস্থান হিসেবে নয় বরং গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে ধারণা করেছেন: কেন্দ্রকে বিবর্তনীয় ত্বরণের গতিবিধি, এবং প্রান্তকে প্রতিবর্তশীল আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা। ইহা আমাদেরকে সমসাময়িক চিন্তাবিদদের সাথে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

মাতুরানা এবং ভারেলাকে অনুসরণ করে, উদাহরণস্বরূপ, নিকলাস লুহ-মান তাদের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়াকারী বিবর্তীত ব্যবস্থার ধারণা দেন- রিবেইরোর সভ্যতাগত কাঠামোর সাথে সামজস্যতা প্রদান করে এমতাবস্থায় প্রশ্ন আসতে পারে: সমাজ, ব্যাক্তি, ও পরিবেশের মধ্যে সভ্যতা কি চুড়ান্তভাবে যোগাযোগের সফলতম ধরন?

রিবেইরোর ধারণাগুলি অবশ্যই ল্যাটিন অ্যামেরিকার মার্কসবাদী নির্ভরশীল তাত্ত্বিক যেমন রুই মাউরো মারিনি, ভানিয়া বাম্বিরা, থিওটোনিও দোস সান্তোস এবং ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা বিশ্লেষনের সাথে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ । সকলেই বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সংকট, কেন্দ্র- প্রান্তিক গতিশীলতা, এবং প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের সাথে লড়াই করছেন।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে, প্রতিসম সংলাপের আহ্বান জরুরী। যেমন এস এফ এলাটাস যুক্তি দেন, দক্ষিণের তত্ত্বগুলি 'সাদামাটা স্বদেশী ধারণা' কে এড়িয়ে চলা উচিত এবং এর পরিবর্তে বিদ্রোহ, বিশ্বজনীন সমাজতত্ত্ব, গড়ে তোলা উচিত। সুজাতা প্যাটেলের আইএসএ হ্যান্ডবুক অফ ডাইভার্স সোসিওলজিক্যাল ট্রাডিশান এই বহুত্ত্ববাদের উদাহরণ যা জাতীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য জুড়ে সংলাপকে উৎসাহিত করে।

সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, অয়াংলোফোন পোস্টকলোনিয়াল স্ট্যাডিজের সাথে ল্যাটিন অ্যামেরিকান ডিকলোনিয়াল চিন্তা, ব্ল্যাক স্ট্যাডিজ, ও প্রান্তিক নারীবাদ এবং অ্যামেরিন্ডিয়ান জ্ঞানতত্ত্ব সংযোগ করা আবশ্যক। এই 'নতুন জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়াবলী' ভূরাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে প্রান্তিকীকরণ রাষ্ট্র, জাতি, ধনতন্ত্র, উন্নয়ন, এবং গণতন্ত্রের মতো মৌলিক ধারণাগুলিতে সমালোচনামূলক অর্ন্তদৃষ্টি নিয়ে আসে।

এই বহুত্ববাদের মধ্যে, ডার্সি রিবেইরোর কাজ উত্তর ও দক্ষিন, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করেছে। একজন সীমা-অতিক্রমকারী বুদ্ধিজীবী, তিনি একইসাথে একজন সামাজিক বিজ্ঞানী, একজন স্বদেশীয় নৃতত্ত্ববীদ, একজন গণব্যক্তিত্ব এবং অপ্রত্যাশিতভাবে, একজন সাহিত্যিক লেখক ছিলেন। ■

সরাসরি যোগাযোগ: অ্যাডেলিয়া মিগলিভিচ রিবেইরোর <miglievich@gmail.com>

**এই প্রবন্ধটি লেখকের বই 'ডার্সি রিবেইরো, সভ্যতা ও জাতি: ল্যাটিন অ্যামেরিকা থেকে সামাজিক তত্ত্ব' রাউটলেজ, ২০২৪ এর উপর ভিত্তি করে লেখা।*

অনুবাদ:
বিজয় কৃষ্ণ বণীক, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের অপব্যবহার ও ফিলিস্তিন

সংহতির বহুমাত্রিক দমন

লেখকেরা নিজেদের কর্মস্থল, জার্মান গণমাধ্যম, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন।

ক্রেডিট: ফ্রিপিক।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রান্সেস্কা পি. আলবানিজকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে "কন্ডিশনস অফ লাইফ ক্যাল্কুলেটেড টু ডেস্ট্রয়: লিগাল এন্ড ফরেনসিক পার্স্পেক্টিভেস অন দ্যা অনগোয়িং গাজা জেনোসাইড" বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রণ জানান। নিরাপত্তার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর স্বল্প সময়ের নোটিশে সশরীরে বক্তৃতাটি বাতিল করেন। এই পরিস্থিতিতে, আলোচনা সভাটি অন্য জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জার্মানির রাজনৈতিক নেতারা গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা চালানোর বিষয়ে আলবেনিজের অবস্থানের জন্য তাকে ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যা দেন। অনুষ্ঠানটি বাতিলের জন্য বার্লিনের মেয়র, বার্লিনের বিজ্ঞান বিষয়ক সিনেটর এবং ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত চাপ প্রয়োগ করেন। ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের "হামাস সমর্থকদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির" বলে অভিহিত করেন। জার্মান গণমাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনে আলবেনিজকে "বিশ্বব্যাপী সমালোচিত এক উগ্র ইসরায়েল বিদ্বেষী" বলে অভিহিত করা হয়। এর আগে মিউনিখের লুডউইগ ম্যাক্সিমিলিয়ান ইউনিভার্সিটিও একই কারণ দেখিয়ে আলবেনিজের আরেকটি বক্তৃতা বাতিল করেছিল। পরপর এই ধরনের বাতিলের ঘটনায় আলবেনিজ বলেন: "আমি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এভাবে ব্যাপক চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে দেখিনি; তবে আমি কখনও এত চাপও দেখিনি।" আলবেনিজের বক্তৃতা বাতিল করা জার্মানিতে ভিন্নমতকে স্তব্ধ করার অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি।

>ভিন্নমতের স্তব্ধকরণ

গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে, জার্মানিতেও ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এই আন্দোলন জার্মান কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন স্তরের দমন-পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক বিদ্যমান সাহিত্য অনুসারে, "স্তব্ধকরণ" বলতে বোঝায় কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিভঙ্গি, বা প্রকাশের অন্যান্য রূপের-যেগুলো প্রভাবশালী বয়ান বা ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে-সেগুলোর পদ্ধতিগত দমন, প্রান্তিককরণ, বা বৈধতাহীন করা। এটি প্রায়ই প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, বা বাচনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত ২০০টিরও বেশি (প্রকাশ্যে রিপোর্টকৃত) কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বক্তৃতা, একাডেমিক নিয়োগ, পুরস্কার প্রদান, সাংস্কৃ

>>

তিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং শিল্প পরিবেশনা। এছাড়াও পুলিশের সহিংস দমন-পীড়নের মাধ্যমে রাস্তায় বিক্ষোভ দমন করা হয়েছে এবং এমনকি বার্লিনে বিক্ষোভে আরবি ভাষা ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে ইহুদিবিদ্বেষের ধারণাকে ব্যবহার করে গাজায় গণহত্যার সমালোচনা ও ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতির প্রকাশকে জার্মান একাডেমিয়া ও তার বাইরেও স্তব্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা বিশেষভাবে একটি প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করেছি -জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের একটি নির্দিষ্ট ও কৌশলগতভাবে নির্মিত ধারণাকে অস্পষ্ট ও নমনীয় একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এই স্তব্ধকরণকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। ডোনাটেলা ডেলা পোর্টা জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষের বিতর্ককে নৈতিক আতঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং পিটার উলরিখ এটিকে কর্তৃত্ববাদী ইহুদি-বিদ্বেষবাদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এই ভিন্ন ধারণাগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায়, কীভাবে কথিত ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ ও ভাষ্যকে অস্পষ্ট রেখা বরাবর ব্যবহার করে আদর্শিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে - যা বিভিন্ন পরিসর ও প্রেক্ষাপটে নানা উপায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা মোটেও বলছি না যে জার্মানিতে ইহুদিবিদ্বেষ নেই; এটি অবশ্যই আছে এবং দেশের দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও বর্ণবৈষম্য-বিরোধী সংগ্রামে এর প্রতিফলন দেখা যায়। আমাদের বক্তব্য হল, যদি ইহুদি-বিদ্বেষের লেবেল ইসরায়েলি সরকারের সমস্ত সমালোচনা বা ফিলিস্তিনের সাথে সংহতিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে সমালোচনামূলক আলোচনা দমন করা হবে। এই ধরনের বাছবিচারহীন ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্ষতিকর ইসরায়েলি নীতিমালার সমালোচনা ও আলোচনা বন্ধ করে দেয়, যা জার্মানিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সৎ ও উন্মুক্ত বিতর্ককে বাধাগ্রস্ত করে।

> কেন এই স্তব্ধকরণ?

জার্মানির বাইরে অনেক পর্যবেক্ষক দেশ স্তব্ধকরণের হাতিয়ার হিসেবে ইহুদিবিদ্বেষের অপব্যবহারের প্রতিরোধ এবং সচেতনতার অভাব দেখে হতবাক। প্রকৃতপক্ষে, ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ অন্যান্য দেশেও (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে) দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে, জার্মান প্রেক্ষাপটের কিছু স্বতন্ত্র দিক রয়েছে।

প্রথমত, এর পেছনে অন্যতম বড় কারণ হলো - জার্মান প্রপঞ্চ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে হলোকস্টের সম্পর্ক। জার্মানির রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় এমনভাবে কাঠামো নির্মিত হয়েছে যেখানে ইসরায়েল সরকারের প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে জার্মানির রাষ্ট্রনীতির মৌলিক নীতি সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। হলোকাস্টের জন্য ঐতিহাসিক দায় স্বীকারের অংশ হিসেবে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও তা প্রতিরোধ করাকে জার্মান সরকারের অগ্রাধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই নীতি আইনি কাঠামো, রাজনৈতিক ভাষ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীরভাবে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এসব প্রতিষ্ঠানই জার্মান সমাজে সামাজিক নিয়ম, মানদণ্ড এবং মূল্যবোধ গঠনে প্রভাব রাখে, যা একটি নির্দিষ্ট আত্মপরিচয়ের দিকে পরিচালিত করে। এমনকি জার্মান বামপন্থীদের একটি অংশ তথাকথিত "জার্মান-বিরোধী" সচেতনতা গ্রহণ করেছে, যা জার্মানির জাতীয় পরিচয়কে তার ফ্যাসিবাদী ও ইহুদিবিদ্বেষী অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে মনে করে এবং নিজেকে ইসরায়েলপন্থী হিসেবে অবস্থান করে। ফলে ইসরায়েল সরকারের নীতির যে কোনো সমালোচনাকেই ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হলোকস্টের জন্য এই ধরনের ঐতিহাসিক অপরাধবোধভিত্তিক যৌথ স্মৃতিচর্চা রাজনৈতিক বিভাজন পেরিয়ে জার্মান প্রতিষ্ঠান, সরকারি গণমাধ্যম ও বৃহৎ সমাজের অনেক অংশে নিরপেক্ষতা ও সমালোচনাবোধ ছাড়াই ইসরায়েল সরকারকে সমর্থন দেয়। ফলে ইসরায়েল প্রসঙ্গে সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবেশ করার প্রবণতা কমে যায়।

তৃতীয়ত, জার্মানির ডানপন্থী কট্টর জাতীয়তাবাদীরা, যারা ইহুদিবিদ্বেষের মূল প্রবক্তা, তারাও ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতির কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করার পক্ষে সোচ্চার। কারণ, এর মাধ্যমে তারা তাদের বর্ণবাদী, অভিবাসনবিরোধী, আরববিদ্বেষী ও ইসলামভীতিক রাজনীতি চালানোর কৌশলগত সুযোগ পায়। আবার, এটি তাদের সাধারণভাবে মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি বর্ণবাদকে আরও বৈধতা দিতে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূলধারার অনেক মানুষ যারা এ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নন, তারাও "ভুল কিছু বলে ফেলার" আশঙ্কায় নীরব থাকেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্পর্কও একটি বড় কারণ। বহু বছর ধরে উভয় দেশের মধ্যে লাভজনক ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য চলছে। ইউরোপে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হলো জার্মানি। গত কয়েক দশক ধরে জার্মানি ইসরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ, এবং ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এই অস্ত্র বিক্রয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জার্মান শিল্প খাতকে ব্যাপকভাবে লাভবান করেছে। দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাসও রয়েছে।

গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ উন্মুক্ত বিতর্ক ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধানে অংশ নেয়নি। ইসরায়েলপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির একচেটিয়া প্রচার হয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা ও মৃত্যুর খবর হ্রাস করা হয়েছে বা উপেক্ষা করা হয়েছে। ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থনের যে কোনো প্রকাশকে ইহুদিবিদ্বেষী, "হামাস সমর্থক" কিংবা "ইসরায়েল বিদ্বেষী" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> জার্মানিতে দমন-পীড়নের একটি নমনীয় এবং অস্পষ্ট হাতিয়ার হিসেবে ইহুদি-বিদ্বেষের নির্মাণ

জার্মানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেভাবে ইহুদিবিদ্বেষকে দমন-পীড়নের বৈধ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ইন্টারন্যাশনাল হলোকস্ট রিমেমব্রেন্স অ্যালায়েন্স (IHRA) কর্তৃক নির্ধারিত কার্যকরী ইহুদি-বিদ্বেষের সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাটি জার্মানিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। তবে এই সংজ্ঞার অস্পষ্টতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে, কারণ এতে ইসরায়েল সম্পর্কে যে কোনো সমালোচনাকেই ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়ে গেছে। জেরুজালেম ডিক্লারেশন অন এন্টিসেমিটিজমের লেখকদের মতে, এই সংজ্ঞায় ইহুদিবিদ্বেষী বক্তব্য আর ইসরায়েল ও জায়োনিজমের প্রতি বৈধ সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ইহরা (IHRA)-র এই অস্পষ্টতা জার্মানিতে রাজনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগকে কৌশলগতভাবে অপব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সম্প্রতি জার্মান পার্লামেন্টে সর্বসম্মতভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে - ৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে "আর কখনো নয় এখনই - জার্মানিতে ইহুদি জীবনকে সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণ" এবং ৩০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে "বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদি-বিরোধিতা এবং ইসরায়েলের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব মোকাবিলা এবং আলোচনার জন্য মুক্ত পরিসর নিশ্চিতকরণ" এই প্রস্তাবদ্বয় বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইহরা (IHRA) সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইহুদিবিদ্বেষী বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়

>>

প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে বয়কটের আহ্বান জানানো ব্যক্তি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার নির্দেশনা রয়েছে - যার মধ্যে রয়েছে "বর্জন, বিনিয়োগ প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা' আন্দোলন এবং অনুরূপ আন্দোলনসমূহ"। এভাবে ইহরা (IHRA) সংজ্ঞাকে ভিন্নমত দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও ইহুদিবিদ্বেষ গবেষকগণ এই দুই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন কারণ এগুলো একাডেমিক স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। প্রস্তাবের দাবি অনুসারে এগুলো "ইহুদি জীবন রক্ষার জন্যচ প্রণীত হলেও বাস্তবে এগুলো এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী কৌশলে পরিণত হয়েছে, যা বৌদ্ধিক বিনিময় ও জ্ঞানচর্চাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো - এগুলো শিক্ষা খাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দরজা খুলে দিচ্ছে। এর ফলে শুধু জার্মানিতেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও শিক্ষাবিদদের প্রোফাইলিং ও ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করার প্রবণতা বাড়তে পারে। এতে আত্ম-নিরবতা আরও বাড়বে এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় সংকুচিত হবে। সম্প্রতি ইহরা (ওঐজঅ) সংজ্ঞার অন্যতম লেখক কেন স্টার্ন মন্তব্য করেছেন: "এই সংজ্ঞা কলেজ ক্যাম্পাসে বক্তব্যকে টার্গেট করার বা নিরুৎসাহিত করার হাতিয়ার হিসেবে খসড়া করা হয়নি এবং এটি কখনই সে উদ্দেশ্যে প্রণীতও হয়নি।"

> একাডেমিয়ায় স্তব্ধকরণ

স্পিকার, সম্মেলন ও কর্মশালা, একাডেমিক নিয়োগ ও পদ এবং ফিলিস্তিনের সমর্থনের সাথে সম্পর্কিত গবেষণা অনুদান বাতিল করার বিষয়ে জনসাধারণের কাছে উপলব্ধ তথ্যের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, যা আর্কাইভ অফ সাইলেন্স দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিভার্সিটি অব কোলোনে প্রফেসর ন্যান্সি ফ্রেজারের ভিজিটিং প্রফেসরশিপ বাতিল করা হয়েছে। ব্রিটিশ-ফিলিস্তিনি সার্জন ও ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর রেক্টর ড. ঘাসান আবু সিত্তাহ-কে জার্মানিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তবে পর্দার আড়ালে যেসব নী-রবতা ও দমন-পীড়ন সংঘটিত হয় তার বিস্তারিত আমরা খুব কমই জানি। এইসব ঘটনা প্রচারের বাইরে থাকে বিধায় এর ওপর পদ্ধতিগত তথ্য সংগ্রহ কঠিন। আমাদের ধারণা, জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জুড়েই এই স্তব্ধকরণ ঘটছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদরা নিয়মিত এসব অভিজ্ঞতা একে অপরের সাথে আলোচনা করেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি, যেখানে ভুক্তভোগীরা তাদের পরিচয় গোপন থাকতে ইচ্ছুক:

গাজায় মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়ে একটি পাবলিক চিঠিতে স্বাক্ষরকারী একজন গবেষককে ডিন অবহিত করেন যে একজন অজ্ঞাতনামা অভিভাবক (একজন ইহুদি ছাত্রের) তাদের "ইহুদি-বিরোধীচ এবং ইহুদি ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের চাকরির চুক্তির ঝুঁকি এড়াতে, গবেষক তাদের স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেন।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বের দমন-পীড়নের ভয় এবং মিডিয়ার প্রতিক্রিয়ার কারণে একজন অতিথি অধ্যাপককে ফিলিস্তিনি-পন্থী বক্তাদের আমন্ত্রণ জানানো থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।
- এক ফিলিস্তিনি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল করা হয়।
- বিউপনিবেশাবাদ ও ফিলিস্তিন বিষয়ক এক লেকচার সিরিজ ঘৃণাত্মক বক্তব্যের আশঙ্কায় অনুমোদন দেওয়া হয়নি।
- বিডিএস আন্দোলন নিয়ে আলোচনার একটি অনুষ্ঠানের সময়সূচীতে বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করেছিল।
- এক গণহত্যা গবেষককে কোর্সে "সটলার কলোনিয়ালিজম" শব্দটি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের মানসিক অস্বস্তির আশঙ্কায়।

এই ঘটনাগুলোর ভুক্তভোগীরা বেশিরভাগই ছিলেন অনিশ্চিত একাডেমিক পদে থাকা ব্যক্তিরা, যেমন: পিএইচডি শিক্ষার্থী, পোস্টডক্টোরাল গবেষক ও স্থায়ী পদবিহীন অধ্যাপক এবং অধিকাংশই ছিলেন অ-জার্মান। সাধারণত এই ধরনের স্তব্ধকরণের পেছনে গণমাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারের আশঙ্কা বা শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষতির আশংকা থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশ ডেকে এনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক সরিয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনি ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা ও জরিমানা আরোপ করেছে। ইউনিভার্সিটি অব হামবুর্গ এবং ফ্রি ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন ছাত্র আন্দোলন নিষিদ্ধ করেছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম, বিশেষ করে ট্যাবলয়েড বিল্ড, আন্দোলনের পক্ষে স্বাক্ষর দেওয়া অধ্যাপকদের বক্তব্যকে ইহুদিবিদ্বেষী ঘৃণাবাক্য হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অপসারণে বাধ্য করেছে। একটি বিরল ঘটনায়, বার্লিনের বার্লিনের অ্যালিস সলোমন কলেজের সভাপতি ছাত্র আন্দোলনকারীদের সরাতে পুলিশ ডাকেননি বলে গণমাধ্যম তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণের দায়িত্ব লজ্ঘনের অভিযোগ তোলে; রক্ষণশীল রাজনীতিকরা তার পদত্যাগ দাবি করেন। অতি সম্প্রতি, ২০২৫ সালের এপ্রিলে, বার্লিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভের কারণে চারজন বিদেশী/ অ-জার্মান ছাত্রের বিরুদ্ধে নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করে।

> স্ট্রিট প্রোটেস্ট স্তব্ধকরণ

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে জার্মানিও রয়েছে। এসব বিক্ষোভে বিভিন্ন কর্মী গোষ্ঠী, এনজিও ও তৃণমূল সংগঠন, শান্তি আন্দোলন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও সংহতি সংগঠন (ইহুদি সংগঠনসহ), এবং জার্মানির বর্ণবাদবিরোধী ও গণতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠীসমূহ অংশগ্রহণ করেছে। তবে এই বিক্ষোভগুলোকে ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে আখ্যায়িত করে পুলিশের শারীরিক দমন-পীড়ন ও স্থানীয় সরকারের আইনি বিধিনিষেধের মাধ্যমে দমন করা হচ্ছে, এবং এটিতে ট্যাবলয়েডসহ মূলধারার কিছু মিডিয়ার জোরালো সমর্থন রয়েছে।

ইউরোপের বৃহত্তম ফিলিস্তিনি প্রবাসী জনগোষ্ঠীর শহর বার্লিনে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বিক্ষোভে বিক্ষোভকারীদের দাঙ্গা পুলিশ, শারীরিক নির্যাতন, গ্রেপ্তার এবং নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পুলিশ প্রায়শই উত্তেজনাকর কৌশল প্রয়োগ করেছে, যার ফলে উস্কানি, সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ এবং হামাসকে সমর্থনের অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগে শত শত (শিশুসহ) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, এসব অভিযোগের ফলে বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগের আইনি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভ দমনে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্লিনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্লোগানে (মুখে উচ্চারণ কিংবা ব্যানারে) আরবি ভাষা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এছাড়া, পুলিশ যাতে আরবি কোনো স্লোগান শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যে ড্রাম বাজানোও নিষিদ্ধ করা হয়। ট্যাবলয়েড বিল্ড এবং বিঞ্জ এর মতো কিছু সংবাদমাধ্যম শুধু ভাষা নিষেধাজ্ঞাকেই সমর্থন করেনি, বরং আরও কঠোর দমন-পীড়নের আহ্বানও জানিয়েছে। আরবি ভাষাকে অপরাধের ভাষা বা "প্রচারমূলক অপরাধ" এর ভাষা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মুসলিম-বিরোধী এবং আরব-বিরোধী মনোভাবকে আরও উস্কে দেয়।

>>

এই তীব্র দমন-পীড়নের ভিত্তি হলো স্লোগান, প্রতীক এবং বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ইহুদি-বিদ্বেষের ব্যাপক অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও দমনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ইহুদি-বিদ্বেষের সাধারণ অভিযোগের ব্যবহার স্থানীয় প্রেক্ষাপটকেও ছাপিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, বার্লিনে, নিউকোলন এবং ক্রুজবার্গ জেলায় অনেক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়; এই এলাকাগুলোতে বড় আরব ও অভিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই এখানকার রাজনৈতিক সচেতনতা ও একটিভিজম প্রবল। উচ্চ অভিবাসী জনসংখ্যার কারণে এসব অঞ্চল "সমস্যাপূর্ণ জেলা" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অতীতে পুলিশ ও প্রতিবাদকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা বারবার ঘটেছে। এসব এলাকায় বিক্ষোভ দমনের ধরন অতীতে জাতিগত প্রোফাইলিংভিত্তিক পুলিশি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিল। এ ধরনের দমন-পীড়ন শুধু সমাবেশের স্বাধীনতাকেই খর্ব করে না বরং জাতিগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশি তৎপরতা এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের উপর বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেও শক্তিশালী করে।

> ইহুদিবিদ্বেষের হাতিয়ারকরণ

এখানে ঝুঁকির মাত্রা অত্যন্ত উচ্চঃ ইসরায়েলের নীতি, সামরিক অভিযান এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনাকে দমন করতে ইহুদিবিদ্বেষের অপব্যবহার জার্মানিতে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এর প্রভাব বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। এই প্রবণতা গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক-আদর্শিক হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেয়, যা একাডেমিক স্বাধীনতার সরাসরি জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এটি সমাবেশ ও প্রতিবাদের অধিকারে দ্বিমুখী মানদণ্ডের প্রয়োগকে সহজতর করে, বিশেষত আরবভাষী অভিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে অপরাধীকরণ করে; ফলে জার্মান সমাজে মুসলিম-বিদ্বেষী এবং আরব-বিদ্বেষী বর্ণবাদ আরও তীব্র হয়। এই প্রক্রিয়া ডানপন্থী চরমপন্থার স্বাভাবিকীকরণেও অবদান রাখে, যা এই ইস্যুকে ব্যবহার করে নিজেদের চরম ডানপন্থী ইহুদিবিদ্বেষ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখে। এভাবে ইহুদিবিদ্বেষকে স্তব্ধকরণের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ফলে প্রকৃত ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও মানুষ নিরুৎসাহিত হতে পারে। জার্মানিতে বর্ণবাদ, বিদেশি-বিদ্বেষ ও ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে গভীর আলোচনা করার সুযোগ বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে, যা নাগরিক সমাজের ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপের জন্য এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। ইহুদিবিদ্বেষকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক স্তব্ধকরণের হাতিয়ার হিসেবে বহুমুখী ও কৌশলীভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জার্মানি এক বিপজ্জনক পথে এগোচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশটির বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে - যা জার্মান সন্ডারওয়েগ (জার্মান ব্যতিক্রমবাদ)-এর পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত দেয়। এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জার্মানির বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা এবং আহ্বান স্বরূপ, যা বাকস্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার ও মুক্ত অনুসন্ধানের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে; যাতে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের নীতিগুলো বজায় রাখা যায়। ■

অনুবাদঃ
তাসলিমা নাসরিন, এমএসসি স্টুডেন্ট, রসকিল্ড ইউনিভার্সিটি, ডেনমার্ক।

> বিভক্ত নগর ঃ ইরানে নারীবিদ্বেষী নগরায়নের সমালোচনা

আর্মিতা খালাতবারী লিমাকি, স্বাধীন গবেষক, স্থপতি, ডিজাইনার, ইরান

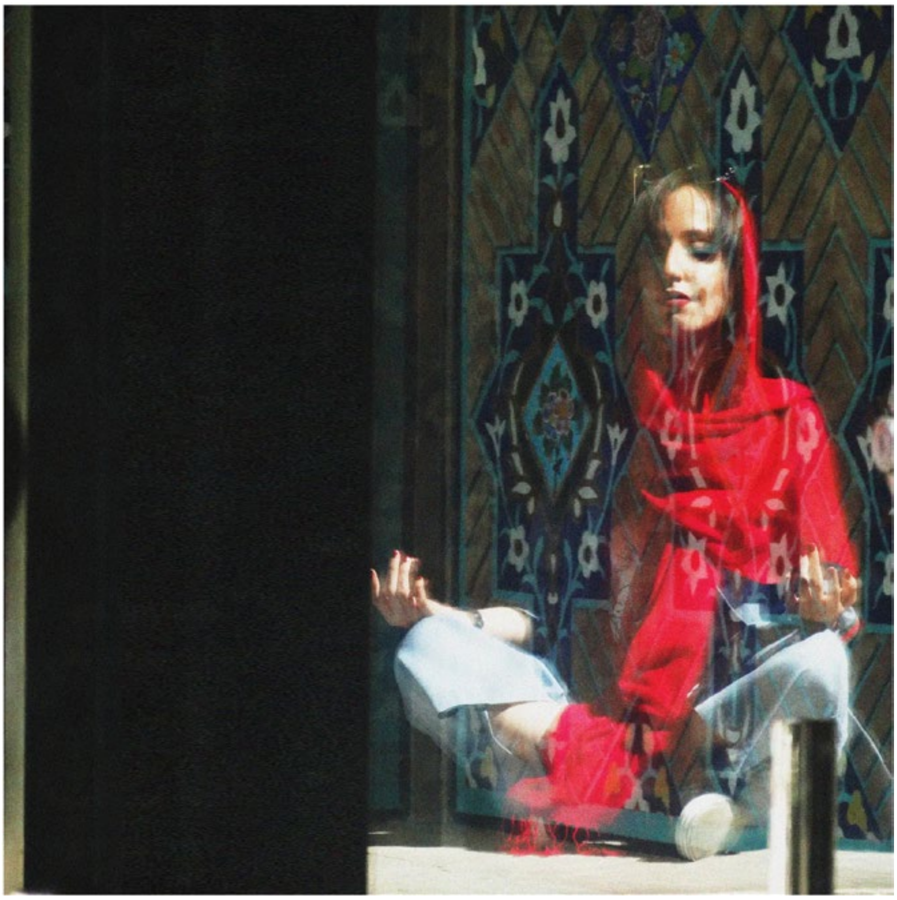

দ্য রেড স্কার্ফ, তেহরান নিয়াভারান কমপ্লেক্স, ২০১৪। ক্রেডিট: আর্মিতা খালাতবারী লিমাকি।

নগর উন্নয়নে নারীদের অবস্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অনুপস্থিতি একটি সম্মিলিত আলোচনার দাবী রাখে বিশেষ করে যেসকল দেশে ধর্মীয় আইন প্রচলিত আছে। এই ছোট্ট রচনাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার একটি উদাহরণ এবং এটি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও লিখিত আইনের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আমার পদ্ধতিটির ধরণ হলো তাত্ত্বিক এবং আমার উদ্দেশ্য হলো সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে একটি সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নারী ও নগর এলাকা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যকার জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা।

> কোনো নির্দেশকই নারীবান্ধব পরিবেশকে উদ্বুদ্ধ করে না

প্রায় বিশ বছর আগে, ইরানে "লেডিস পার্ক" নামক একটি নগর পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়- যার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের স্বাধীনতা ও জনপরিসরে সামাজিক সক্রিয়তা জোরদার করা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের জন্য নগরের কিছু নির্দিষ্ট জনপরিসর বরাদ্দ করে নিরাপত্তা ও স্বস্তিদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করা। এই পার্কগুলো সবুজ গাছপালা, ঝর্ণা এবং রঙিন ফুলে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু দেশটির প্রচলিত আইন এই পার্কগুলোর মূল লক্ষ্য ও বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরির ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে, অল্প কিছু নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া, অধিকাংশ নারী এসব পার্ককে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বলে মনে করেননি। বরং তারা এগুলোকে একধরনের কৃত্রিম ও বাস্তবতাবিবর্জিত নির্মাণ হিসেবে দেখেছেন, যা এক ধরনের নিপীড়নমূলক এবং অবিচারপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা কিংবা এর জনপ্রিয়তা না পাওয়ার পেছনে মূল কারণ নিহিত রয়েছে সেই ভ্রান্ত ধারণায় যে, কিছু বিষয় যেগুলো মৌলিকভাবে অবিচ্ছেদ্য, সেগুলোকে আলাদা করে দেখা বা আলাদা করা সম্ভব। কিছু গুণাবলি রয়েছে যেগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না; বরং এসব বৈশিষ্ট্য এমন যা একটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে কিংবা তার প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবাহিত হতে হয়। তাই বলা যায়, এসব চলমান ও গতিশীল গুণাবলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করার চেষ্টা এবং সদা পরিবর্তনশীল একটি অভিজ্ঞতাকে ধারণ করার কল্পনা কেবল বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি করেছে, এবং সেই কারণেই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়েছে। একটি শহর বা নগরে পৌরুষত্ব

>>

প্রকাশ করার জন্য যেমন শহরের মধ্যে বিশেষ কোনো চিহ্ন বা লেবেলের প্রয়োজন হয় না, ঠিক একই ভাবে কোনো পার্কের প্রবেশপথে কেবল একটি সাইনবোর্ড বসিয়ে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাও সম্ভব নয়।

> আত্মিক ও সাবলীল গুণাবলিগুলোকে সীমানার ভেতরে আবদ্ধ করার ফলে বিভক্ত আবেগের সৃষ্টি

শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যখন বিশেষ কোনো জনপরিসর বরাদ্দের চিন্তা করা হয়, তখনও অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আমি এখানে জমির ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চল বিভাজনের ধারণাকে মৌলিকভাবে ভুল বলছি না বরং আমি আবেগগত অঞ্চলায়ন কে তুলে ধরতে চাচ্ছি যেটি তুলনামূলকভাবে একটি অধিক মৌলিক ব্যবধান কে নির্দেশ করে যা সর্বত্র বিদ্যমান এবং একই সঙ্গে মৌলিকভাবে অপ্রতিরোধযোগ্য। কিছু গুণাবলি যেমন- পরিতৃপ্তি, আনন্দ, স্বচ্ছতা এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচি-তির অনুভব এগুলোকে একটি স্বাস্থ্যকর শহরের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও-এগুলোকে কোনো আইন বা বিধিমালার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

যখন এই আত্মিক ও সাবলীল গুণাবলিগুলোকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে শহরের পরিসরকে বিভক্ত করা হয়, তখন এই গুণাবলিগুলোকে শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপভোগ করার বদলে আমরা সেগুলোকে কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে প্রকাশিত হতে দেই। এর ফলে যা তৈরি হয়, তা মূলত অপূর্ণ, অকার্যকর এবং বিমূর্ত। এই প্রক্রিয়াটি পরোক্ষভাবে এই ধারণাকে অনুমোদিত করে যে, একটি শহরকে বিভক্ত করা উচিত এবং প্রতিটি খণ্ড থেকে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে-কিন্তু তা সেই সীমানার বাইরেই আর কার্যকর হবে না।

ফলে, জনসাধারণের পার্ক এবং বিনোদনকেন্দ্রের বিস্তারের মাধ্যমে "সুন্দর জীবন অভিজ্ঞতার" সংখ্যাগত মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, এই পরিস্থিতিতে একইভাবে একটি সংহত আবেগীয় পরিবেশ শহরজুড়ে গড়ে ওঠে না। বরং শহরের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের আবেগ বিভক্ত হতে থাকে, যার মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত সংযোগ থাকে না। ফলে নাগরিকদের বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে এসব অনুভূতির খোঁজ করতে হয় এবং সেগুলোকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তবেই তা উপভোগ করতে হয়। বস্তুত, এই ধরনের পরিবেশ থেকে স্বাভাবিক ও সংযত আচরণ প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। এবং এমন পরিস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

> একটি নগর সবসময় তার বাসিন্দাদেরই প্রতিফলন ঘটায়, যাদেরকে কখনোই উর্ধ্বতন পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়

আমার সমালোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো, যে সিদ্ধান্তগুলোর লক্ষ্য বিশৃঙ্খলতা হ্রাস করা, বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলো বিদ্যমান অসঙ্গতিকেই আরও বাড়িয়ে তোলে। জীবনের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার চেয়ে দৃশ্যমান শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তগুলো একদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক হলেও, অন্যদিকে আইন ও প্রচলিত সামাজিক চুক্তির মতো পরিচিত এবং বৈধ কাঠামোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ধরনের একটি টানাপড়ন তৈরি করে। আসলে এই কারণেই কঠোর এবং স্থবির অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনাগুলো (zoning schemes) ব্যর্থ হতে বাধ্য-কেননা এগুলো মানুষের আচরণের গতিশীল প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে। এসব পরিকল্পনা হয় এমন কোনো গুণাবলির বাড়াবাড়ি প্রদর্শন যা বাস্তবে বিরল অথবা এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায়।

এই ধরনের একটি শ্রেণিভিত্তিক কাঠামো, যা সামাজিক বৈষম্যের মুখে নীরব থাকে এবং সকল মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়নের চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত একটি খণ্ডিত সমাজের জন্ম দেয়। সেখানে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে পৃথক শ্রেণিতে-কেউ কেউ আরোপিত শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, আর অন্যরা ছিটকে পড়ে যায় এর বাইরে। এই পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য এক অবসাদগ্রস্ত ও জটিল সমস্যায় পরিণত হয়; সহিংস আচরণ, অপরাধ ও বিচ্যুতি খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়; এবং সার্বজনীন সন্তুষ্টি এক বিরল ও মূল্যবান রত্নে পরিণত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তির বসবাসের স্থান-নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস সর্বপ্রথম তার মানসিক অবস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে। প্রকৃতপক্ষে, নগর পরিকল্পনার নিয়ম-কানুনগুলোর উচিত-শহরের বিদ্যমান সাংস্কৃতিক মান, মূল্যবোধ ও সামাজিক আচরণবিধির সঙ্গে প্রথমে সাযুজ্য স্থাপন করা। এই নিয়মগুলোর ভিত্তিতে শহরকে পরিবর্তন করতে বলার চেয়ে বেশি বাস্তবসম্মত হলো শহরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাঠামোকে বিবেচনায় নেওয়া। ফলে, নগর উন্নয়নের জন্য আইন ও বিধিমালার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও, যদি স্থানীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, তবে এসব নিয়ম শুধু অর্থহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর ফলে, একটি মৌলিক সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রত্যাশা অবাস্তব হয়ে ওঠে।■

সরাসরি যোগাযোগ: আর্মিতা খালাতবারী লিমাকি <armita.khalatbari@yahoo.com>

অনুবাদ:
মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ,
দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (পিইউবি)।

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/

www.isa-sociology.org